Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কারবালার ইতিহাস

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আয়শা সিদ্দিকা

রোলঃ 216022088

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কারবালার ইতিহাস

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আয়শা সিদ্দিকা

রোলঃ 216022088

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কারবালার ইতিহাস " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আয়শা সিদ্দিকা, আইডিঃ 216022088 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কারবালার ইতিহাস " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

আয়শা সিদ্দিকা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

আয়শা সিদ্দিকা

আইডিঃ 216022088

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার........6

প্রাককথন........7

আলি রাঃ এর শাহাদাত........8

হাসান বিন আলি রাঃ এর খিলাফত........9

সন্ধির ঘোষণা এবং বিরোধীদের আচরণ........10

বিরাট বাহিনী নিয়ে হাসান রাঃ এর শামে যাত্রা........10

হাসান রাঃ ও মুয়াবিয়া রাঃ এর সন্ধিচুক্তি........11

হাসান রাঃ এর ইন্তেকাল........13

খেলাফতে মুয়াবিয়া রাঃ........13

পরবর্তী খলীফা নির্ধারণ........15

ইয়াজিদকে পরবর্তী খলীফা নির্ধারণের কারণ........16

ইয়াজিদকে মুয়াবিয়া রাঃ অসিয়ত........18

মুয়াবিয়া রাঃ এর ইন্তেকাল........19

ইয়াজিদের খিলাফত........20

হুসাইন রাঃ ও আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর বায়আত না হওয়ার কারণ........21

ইয়াজিদের রাজনৈতিক ভুল পদক্ষেপ........22

আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের এবং হুসাইন রাঃ এর মক্কা থেকে মদিনা রওনা........23

একটি প্রশ্নঃ হুসাইন রাঃ কি রাষ্ট্রদ্রোহী ছিলেন?........24

মদীনার পরিস্থিতি এবং ওলিদ বিন উতবাকে বরখাস্তকরণ........25

হুসাইন রাঃ এর কুফায় যাবার সিদ্ধান্ত........26

সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ইয়াজিদের বায়আত গ্রহণ........27

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের প্রতি ইয়াজিদের পত্র এবং হুসাইন রাঃ এর প্রতি কুফাবাসীর পত্র........28

মুসলিম বিন আকীলকে কুফায় প্রেরণ........29

হুসাইন রাঃ এর কুফা যাওয়ার প্রস্তুতি ও আত্মীয়-স্বজনদের বাঁধা প্রদান........30

কুফায় নতুন গভর্নর নিয়োগ ও মুসলিম বিন আকীলকে হত্যা........32

ইয়াযিদের কাছে হুসাইন রাঃ এর রওনার সংবাদ ও মারওয়ানের পত্র........33

উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের প্রতি ইয়াযিদের পত্র 34

মুসলিম বিন আকীলকে হত্যার সংবাদ 35

উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ এর কর্মকাণ্ড 36

হুসাইন রাঃ এর তিনটি প্রস্তাব 37

যুদ্ধের ময়দান 38

হুসাইন রাঃ কে অপমান 39

হুসাইন রাঃ এর শাহাদাত 40

ইতিকথা 42

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন এর জন্য, যিনি আমাদেরকে দ্বীনি ইলম অর্জন করার তৌফিক দান করেছেন। দুরুদ ও সালাম তাঁর হাবিব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। যেসব মুমিন ও দাঈ ব্যক্তিদের কারণে আজকের দ্বীন আমাদের কাছে পৌঁছেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি রহমত এবং মাগফিরাত দান করুন।

কৃতজ্ঞতা জানাই সম্মানিত উস্তাদ জনাব জোবায়ের হাসানের প্রতি, আমাদেরকে গবেষণা কর্মটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো সময়টি তিনি নিরলসভাবে আমাকে নির্দেশনা দিয়েছেন।

আমাদের মাদ্রাসার প্রত্যেক উস্তাদ, মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা এবং বাকী সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, যারা আমাদের দ্বীনি ইলম অর্জনের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করে গেছেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আইওএম (IOM) এ বারাকাহ দান করুন। IOM এর সাথে সম্পৃক্ত সকলের মেহনতকে কবুল করুন।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমাদের সকলকে দ্বীনি বিষয়ে আরো উপকারী জ্ঞান অর্জনের তৌফিক দান করুন। আ

প্রাককথন

'কারবালা'

ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রান্তর। নবিজীর আদরের নাতি, জান্নাতি যুবকদের সর্দার হযরত হুসাইন রাঃ এর শাহাদাতের সাক্ষী।

এর ইতিহাস নিয়ে বিভিন্ন কল্প কাহিনি ও বানোয়াট গল্প ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তবে সত্য ইতিহাস বড়ই মর্মান্তিক ও লোমহর্ষক। এ নির্মম ঘটনা বিশ্ব মুসলিমের হৃদয়ে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে।

স্বল্প সময়ের মধ্যে এ ইতিহাস বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা বেশ কঠিন। এতদসত্ত্বেও এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উক্ত থিসিস পেপারে বর্ণনা করা হয়েছে।

এর যাবতীয় ভুল-ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ থাকবে। সর্বোপরি আল্লাহ তা'লার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন এটি দ্বারা আমাদেরকে উপকৃত করেন। জ্ঞানের বিশাল রাজ্যে আমার এই ক্ষুদ্র ও নগণ্য প্রচেষ্টা সার্থক হলেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করবো। আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টিই আমার এ প্রচেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য।

আলি রাঃ এর শাহাদাত

৩৯ হিজরিতে মুয়াবিয়া রাঃ এর সাথে সন্ধিচুক্তি করার মাধ্যমে মুসলিমদের শান্তি ফিরে আসে। কিন্তু দুশমনেরা তা সহ্য করতে পারেনি। তাই তারা নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু । খারেজিরা এ সন্ধিচুক্তি মেনে নেয়নি। তারা আলি রা; এর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়।

সেসময় মুসলিম জাহানে তিনজন ব্যক্তি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। একজন হলেন আমিরুল মুমিনিন আলি রাঃ, অপরজন হলেন মুয়াবিয়া রাঃ এবং তৃতীয়জন হলেন আমর ইবনে আস রাঃ। তাদের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব সমগ্র মুসলিমদের একতাবদ্ধও করে রেখেছিলো। শত্রুরা ভালো করেই জানত এই তিন ব্যক্তি থাকাকালীন কখনই মুসলিমদের মাঝে বিভেদ করা সম্ভব নয়। তাই তারা তিনজনকেই হত্যার পরিকল্পনা করে।

তখন হিজরি ৪০ সন। আলি রাঃকে হত্যার দায়িত্ব নেয় আবদুর রহমান বিন মুজলিম। মুয়াবিয়া রাঃ কে হত্যার দায়িত্ব নেয় বুরাক বিন আব্দুল্লাহ। আমর ইবনে আসকে হত্যার দায়িত্ব নেয় আমর বিন বকর। সিদ্ধান্ত হয় রমাদন এর ১৭ তারিখ এ তিনজনকে হত্যা করা হবে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে ফজরের সময় মিশরের কেন্দ্রীয় মসজিদে খঞ্জর নিয়ে অপেক্ষা করে আমর বিন বকর। ভাগ্যক্রমে সেদিন অসুস্থতার কারনে মসজিদে আসেননি আমর বিন আস। নামাজ পড়ান খারেজা বিন হুজাফা। তিনি শহিদ হয়ে যান।

অন্যদিকে, শামে ফজরের সময় মসজিদে মুয়াবিয়া রাঃ এর উপর হামলা করে বুরাক বিন আব্দুল্লাহ। কিন্তু আঘাত ভুল হয়। মুয়াবিয়া রাঃ আহত হলেও সেদিন আল্লাহ তাকে হেফাজত করেন।

এদিকে কুফার মসজিদে ঘাতক আবদুর রহমান বিন মুজলিম ওঁত পেতে থাকে। যখন আলি রাঃ আসলেন তখন তাঁর উপর হামলা করা হয়।ইসলামের চতুর্থ খলিফা আলি রাঃ ৪০ হিজরি রমাদনে কুফায় ইন্তেকাল করেন।

হাসান বিন আলি রাঃ এর খিলাফত

আলি রাঃ এর শাহাদাতের পর ৪০ হিজরির শাওয়াল মাসে হাসান রাঃ খলিফা হিসেবে নিযুক্ত হন। আলি রাঃ এ ব্যাপারে কোন কিছু নির্ধারণ না করে গেলেও, সেসময় মুসলিম জাহানে তাঁর পুত্র হাসানই সর্বাধিক যোগ্যতা সম্পন্ন ছিলেন। রাসুল সাঃ এর প্রিয় নাতি হাসান রাঃ এর ব্যাপারে সাহাবিরা বলতেন, " রাসুলে আকরামের সাথে সব চেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন হাসান।"

হাসান রাঃ উম্মাহর কল্যাণ ও নেতৃত্বের জন্য যুদ্ধ- রক্তপাতের বিরোধী ছিলেন। এদিকে আলি রাঃ এর ইন্তেকালের পর মুয়াবিয়া রাঃ শামবাসী থেকে বাইয়াত নেয়া শুরু করেন। এমতাবস্থায় খিলাফত এর দুইজন দাবীদার হয়ে যায়।

এ অবস্থায় উম্মাহর শান্তির জন্য মাত্র তিনটি পথ খোলা ছিল- ১।হয় শামবাসী হাসান রাঃ এর হাতে বায়াআত হবে ২।অথবা তাদের সাথে যুদ্ধ হবে ৩।অথবা হাসান রাঃ খিলাফাত ছেড়ে দিয়ে মুয়াবিয়া রাঃ এর হাতে বায়াআত হবেন।

এবার হাসান রাঃ কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হন। শামবাসিরা হাসান রাঃ এর কাছে বায়াআত গ্রহণ করার মত মানুষ ছিল না। ফলে ১ম পন্থা সম্ভব ছিল না। এদিকে মুয়াবিয়া রাঃ তাঁর কাছে পত্র প্রেরণ করেন এই মর্মে যে, হাসান রাঃ যে কোন শর্তের বিনিময়ে তাঁর কাছে বায়আত হতে পারবেন। এ অবস্থায় হাসান রাঃ সিদ্ধান্ত নেন উম্মাহর ঐক্যের জন্য প্রয়োজনে তিনি খিলাফতের দায়িত্ব ত্যাগ করবেন।

হাসান রাঃ বায়আত গ্রহণের সময় বলেছিলেন, "আমি যার সাথে সন্ধি করব, তোমরা তাঁর সাথে সন্ধি করবে। আমি যার সাথে যুদ্ধ করব, তোমরা তাঁর সাথে যুদ্ধ করবে।" কুফাবাসীদের মধ্যে যারা শামের সাথে সন্ধি করতে রাজি নয়, তারা এটি শুনে মনঃক্ষুণ্ণ হয়। হাসান রাঃ চাচাত ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর এর সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করেন এবং বলেন, " আমি মুয়াবিয়া রাঃ এর কাছে খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে মদিনায় ফিরে যেতে চাচ্ছি। অনেকদিন থেকেই এ নিয়ে ঝামেলা এবং রক্তপাত চলছে।" আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর তাকে সমর্থন করেন। হাসান রাঃ নিজ ভাই হুসাইন রাঃ কেও নিজের মতামতের কথা জানান এবং এ ব্যাপারে তাকে বোঝান। হুসাইন রাঃ শুরুতে অমত করলেও পরে রাজি হয়ে যান।

সন্ধির ঘোষণা এবং বিরোধীদের আচরণ

মুয়াবিয়া রাঃ এর বায়আত গ্রহণে রাজি করার লক্ষ্যে হাসান রাঃ সমগ্র ইরাকবাসীকে একত্রিত করেন। তাদের উদ্দেশ্যে তিনি ভাষণ দেন। তিনি বলেন, "আমি যা সিদ্ধান্ত নিয়েছি তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করো না। নিঃসন্দেহে উম্মাহর মধ্যে বিভেদ এর চেয়ে ঐক্য অনেক উত্তম। আমি চাই মুয়াবিয়া রাঃ এর ব্যাপারে তোমরা একমত হয়ে যাও।"

একথা শুনে খারেজি এবং বিরোধীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তারা বলতে লাগল, "আল্লাহর কসম, তিনি তো তাঁর বাবার মতই কুফরি করছেন।" একথা বলে তারা কয়েকজন হাসান রাঃ এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেউ তাঁর চাদর টেনে নেয়, কেউ তাঁর নীচ থেকে জায়নামায টেনে নেয়। অনেকে তাঁর তাবুতে হামলা করে লুটপাট চালায়। এর কিছুদিন পর ষড়যন্ত্রকারীদের একজন তাঁর উরুতে বর্শা দিয়ে হামলা করে। এতে করে তিনি আহত হন।

বিরাট বাহিনী নিয়ে হাসান রাঃ এর শামে যাত্রা

দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই বিরোধীরা হাসান রাঃ কে মুয়াবিয়া রাঃ এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্ররোচনা দিতে থাকে। তাদের পিড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে কয়দিন পর হাসান রাঃ বিশাল বাহিনী নিয়ে শামের দিকে যাত্রা শুরু করেন।

যেহেতু তিনি খলিফা হওয়ার পর থেকেই রক্তপাতে আগ্রহী ছিলেন না, তাই বাহিনী নিয়ে শামে হামলার উদ্দেশ্য ছিল না। হাসান রাঃ মুসলিমদের শত্রু এবং ষড়যন্ত্রকারীদের চাল আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, এরা মুখে বন্ধু হওয়ার ভান করলেও ইসলামের দুশমন। অতএব, মুয়াবিয়া রাঃ এর সাথে সন্ধিচুক্তিই একমাত্র সমাধান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, সব অনুসারীদের একত্রিত করে একটি জনসমাবেশে মুয়াবিয়া রাঃ এর কাছে দায়িত্ব অর্পণ করা।

নিম্নের আলোচনা থেকে তা স্পষ্ট হওয়া যায়-

১। হাসান রাঃ যুদ্ধের এতোটাই বিপক্ষে ছিলেন যে, তাঁর নিযুক্ত আজারবাইজানের গভর্নর মুয়াবিয়া রাঃ এর সাথে যুদ্ধের জন্য পীড়াপীড়ি করলে ,তিনি তাকে বরখাস্ত করে উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে নিযুক্ত করেন।

২। বিশাল বাহিনী নিয়ে শামে যাত্রা, অতঃপর হঠাৎ মুয়াবিয়া রাঃ এর সাথে সন্ধিচুক্তি, এ দ্বারা বোঝা যায় যে, এটি যুদ্ধ যাত্রা ছিল না। নতুবা এত বড় বাহিনীকে কেউ বাধা দেওয়ার ছিল না।
৩। মুসলিম উম্মাহকে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলেন। মুসলিমদের একতাই পারে সব ষড়যন্ত্রকারীদের রুখে দিতে।

হাসান রাঃ ও মুয়াবিয়া রাঃ এর সন্ধিচুক্তি

শামবাসী তাদের এই আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত ছিল না। ফলে তাঁরা আকস্মিক এত বড় বাহিনী দেখে ঘাবড়ে যায়। সংঘাত এড়ানোর জন্য তাঁরা সন্ধির কথা ভাবতে থাকেন। আমর ইবনে আস রাঃ মুয়াবিয়া রাঃ এর কাছে গিয়ে বাহিনী সম্পর্কে অবগত করেন এবং সংলাপের প্রস্তাব দেন। তিনি মুয়াবিয়া রাঃ কে বলেন, " আমি এমন সৈন্যদল দেখতে পাচ্ছি যারা আপনাকে হত্যা না করে ফিরবে না।" মুয়াবিয়া রাঃ বলেন, "এরা ওদের এবং ওরা এদেরকে হত্যা করলে, আমি কাকে দিয়ে সমস্যার সমাধান করবো? নারী এবং শিশুদের কে রক্ষণাবেক্ষণ করবে?" এরপর তিনি কুরাইশের বনু আবদে শামসের বিশিষ্ট দুইজন ব্যক্তিকে ডেকে বলেন, " আপনারা হাসান রাঃ এর কাছে গিয়ে তাকে সন্ধির প্রস্তাব দেন এবং তাঁর সাথে আলোচনা করুন।"
শামের দূতেরা হাসান রাঃ এর কাছে গিয়ে তাঁর সাথে আলোচনা করেন। হাসান রাঃ তাদের বলেন, " আমরা আবদুল মুত্তালিবের সন্তান। আমরা অনেক সম্পদ ব্যয় করেছি। নিশ্চয়ই এ জাতি রক্তের মধ্যে ডুবে আছে।" তাঁর কথার অর্থ ছিল এই যে, সন্ধি কার্যকরের জন্য জনসাধারণকে কিছু সম্পদ বিলিয়ে দেয়া, যাতে করে সন্ধি বিরোধীদের প্রতিহত করা যায়। দূতেরা বললেন, " মুয়াবিয়া রাঃ আপনার কাছে এই বক্তব্য পেশ করেছেন। আপনার মতামত জানতে চেয়েছেন এবং সন্ধি কামনা করেছেন।" হাসান রাঃ তাদেরকে বলেন, " তাহলে এর দায়িত্ব কে নিবে?" দূতেরা বললেন, "আমরা এর দায়িত্ব নিচ্ছি"। অতঃপর হাসান রাঃ এ প্রস্তাবে সম্মত হন। তাঁর এ সিদ্ধান্তের পেছনে কোন ভীতি কিংবা কাপুরুষতা ছিল না। বরং পূর্ণ ক্ষমতা থাকার পরও তিনি এ সিদ্ধান্ত নেন।

সহিহ বুখারিতে (হাদিস নং- ২৭০৪) এই সন্ধি সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে।

হাসান রাঃ সম্পদের শর্ত দিয়েছেন কারণ সন্ধি বিরোধীদের শান্ত রাখার জন্য উপহার দেওয়ার ধারা বজায় রাখা জরুরি ছিল। এজন্য হাসান রাঃ চাচ্ছিলেন মুয়াবিয়া রাঃ ভাতা নির্ধারণ করে দিক। মুয়াবিয়া রাঃ সকল শর্ত মেনেই সন্ধি করতে রাজি হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি এসব শর্ত পূরণ করে ছিলেন। একটি এলাকা থেকে প্রাপ্ত ট্যাক্সের আয় তিনি হাসান রাঃ এর নামে করে দিয়েছিলেন।

অবশেষে শামগামী মহাসড়কের একটি স্থানে সন্ধিচুক্তির জন্য মহাসমাবেশ আয়জন করা হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক মানুষ সেখানে আগমন করে। তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ অন্যতম। তিনি প্রথমে মনঃক্ষুণ্ণ হন এই কারনে যে, এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর মতামত নেয়া হয়নি। পরবর্তীতে তাঁর বোন উম্মুল মুমিনিন হাফসা রাঃ এর পরামর্শে তিনি সেখানে উপস্থিত হন। হাফসা রাঃ তাকে বলেছিলেন, "এ সন্ধির মাধ্যমে আল্লাহ তা'লা উম্মাহকে একত্রিত করে দিচ্ছেন। আপনি রাসুলুল্লাহ সাঃ এর শালা ও উমার রাঃ এর পুত্র। সন্ধিস্থলে উপস্থিত না হওয়া আপনার জন্য শোভনীয় নয়। আমার ভয় হয়, আপনি না গেলে যদি আবার তাদের মধ্যে মনমালিন্য হয়ে যায়।"

অতঃপর সমস্ত বিষয় সিদ্ধান্ত এবং প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে মুয়াবিয়া রাঃ হাসান রাঃকে বলেন, " ঘোষনা করে দেন যে, আপনি খিলাফতের দায়িত্ব আমার হাতে অর্পণ করেছেন।"

হাসান রাঃ মিম্বরে উঠে সবার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, " মুয়াবিয়া রাঃ এর সাথে যে মতবিরোধ ছিল সেখানে আমি যদি হকের উপরে থাকি, তাহলে উম্মাহের শান্তির জন্য, বিরোধ ও রক্তপাত এড়ানোর জন্য নিজের হক ত্যাগ করছি। যদি অন্য কেউ হকদার হয়ে থাকে,তাহলে তার কাছে আমি হক পৌঁছে দিয়েছি।"

এরপর যাবতীয় কর্মকাণ্ড শেষে মুয়াবিয়া রাঃ একটি ভাষণ দেন। সর্বসম্মতিক্রমে মুয়াবিয়া রাঃ খলীফা নিযুক্ত হন।

অবশেষে মাত্র ৬ মাসের খিলাফত শেষে, ৪১ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে হাসান রাঃ মুয়াবিয়া রাঃ এর কাছে খিলাফত হস্তান্তর করেন। ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে হাসান রাঃ মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে মুসলিমদের দীর্ঘ ফাটল ও বিরোধের অবসান ঘটান।

এ কারণে এই বছরকে ঐক্যের বছর বলা হয়। হাসান রাঃ এর এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নবীজি সাঃ এর নিম্নোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়,

"আমার এ দৌহিত্র একজন নেতা। সম্ভবত তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তা'লা মুসলিমদের দুটি বড় দলের মধ্যে মীমাংসা করবেন।"

এরপর হাসান রাঃ কুফায় আসেন। সেখানে তিনি সকলের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেন। এতকিছুর পরও কুফাবাসী মুয়াবিয়া রাঃ এর সাথে সন্ধির কারণে তাকে অপমান করে।

হাসান রাঃ এর ইন্তেকাল

হাসান রাঃ বাকি জীবন মদিনায় কাটান। মুয়াবিয়া রাঃ এর সাথে সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে সমগ্র মুসলিম জাহানে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামের বিজয়ের পতাকা উড়তে থাকে। মুয়াবিয়া রাঃ সব সময় হাসান রাঃ এবং হুসাইন রাঃ কে সম্মান ও খিদমত করেছেন। তাদের জন্য অনেক উপহার, হাদিয়া পাঠাতেন। তাঁরা সব সময় সেগুলো খুশি মনে গ্রহণ করতেন।

৪৯ কিংবা ৫০ হিজরিতে হাসান রাঃ এর ৫৭ বছর বয়সে গোপনে তাকে বিষপান করানো হয়। বিষক্রিয়ার প্রভাবে তিনি ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকিতে মা ফাতিমা রাঃ এর পাশে তাকে দাফন করা হয়।

আলি রাঃ এর ইন্তেকালের পর বংশ মর্যাদা, যোগ্যতা সব দিক থেকে হাসান রাঃ খিলাফতের যোগ্য হওয়ার পরও উম্মাহের পারস্পরিক বিভেদ দূর করার জন্য তিনি খিলাফতের দাবী ত্যাগ করেছিলেন। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে তিনি রক্তপাত এবং ষড়যন্ত্রকারীদের হাত থেকে মুসলিম বিশ্বকে হেফাজত করে ছিলেন। মুসলিমদের ঐক্য ও শান্তির জন্য তাঁর আত্মত্যাগ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে চিরকাল।

খেলাফতে মুয়াবিয়া রাঃ

মুয়াবিয়া রাঃ ইসলাম গ্রহণ করেন মক্কা বিজয়ের পর। তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান এবং মাতা হিন্দা। উসমান রাঃ এর চাচাত ভাই এবং উম্মুল মুমিনিন উম্মে হাবিবা রাঃ এর আপন ভাই। মুয়াবিয়া রাঃ এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে উমাইয়া বংশ শাসন ক্ষমতা লাভ করে। তাই তিনি হলেন প্রথম উমাইয়া শাসক।

মুয়াবিয়া রাঃ জীবনের ৪০ বছর রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। দামেস্ক বিজয়ের পর ১৯ হিজরিতে তাঁর ভাই বিখ্যাত কমান্ডার ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান এর মৃত্যু হলে, উমার রাঃ মুয়াবিয়া রাঃকে তাঁর ভাই এর স্থলে দামেস্কের গভর্নর নিযুক্ত করেন। সেই থেকে তিনি (হিজরি ২০- ৪০) টানা ২০ বছর ধরে শামের গভর্নর ছিলেন। ৪১ হিজরিতে হাসান রাঃ এর দায়িত্ব হস্তান্তরের মাধ্যমে তিনি খলিফা নিযুক্ত হন।

খিলাফতের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে মুয়াবিয়া রাঃ অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণতার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।মুয়াবিয়া রাঃ প্রখর মেধাবি, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলেন। কোথায় কোন পদক্ষেপ নিতে হবে তা তিনি ভালো করে জানতেন। ইরাকের মানুষজন ছিল অত্যন্ত ধোঁকাবাজ। তাই তিনি তাদের জন্য কঠোর গভর্নর নিযুক্ত করতেন। তাঁর খেলাফতে মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ ছিল। কোন উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ দেখা যায়নি। বিদ্রোহী খারেজিরাও মুয়াবিয়া রাঃ এর ব্যক্তিত্বের কারণে কোন সুবিধা করতে পারেনি।

মুয়াবিয়া রাঃ এর শাসন আমলে ইসলামি সম্রাজের মানচিত্র বিস্তার লাভ করে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিজয় অভিযান অব্যাহত ছিল। তিনি শক্তিশালী সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী গঠন করেছিলেন। দক্ষতার সাথে তিনি রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধশালী করে তুলেছিলেন।

পরবর্তী খলীফা নির্ধারণ

এভাবে মুয়াবিয়া রাঃ এর শাসন আমলের বিশ বছর কেটে যায়। তাঁর দীর্ঘ প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইসলামি বিশ্ব শক্তিশালী ও একতাবদ্ধ থাকে। মুয়াবিয়া রাঃ যখন বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হন, তখন তিনি চিন্তা করেন যে, তিনি যদি পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করে না যান তাহলে মুসলিমদের মাঝে আবারও ফিতনা ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়ে যেতে পারে। মুয়াবিয়া রাঃ নিজ গোত্রীয় শক্তির উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি রাষ্ট্রব্যবস্থায় এমন পরিবর্তন এনেছিলেন, এতে করে বনু উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

এ ব্যাপারে তিনি বিভিন্ন সভাসদগণের সাথে পরামর্শ করেন। অনেকেই তাঁর পুত্র ইয়াজিদকে পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করার করা বলেন। কারণ তখন ইসলামি শাসন বনু উমাইয়াদের অধীনে। যদি পরবর্তী খলীফা অন্য গোত্র থেকে নির্ধারণ করা হয়, তাহলে একটি বড় অংশ এর বিরোধিতা করে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ লাগতে পারে।

পরামর্শ সাপেক্ষে তিনি জীবদ্দশায় পরবর্তী খলীফা নির্ধারণ করাকে জরুরি মনে করেন। এক্ষেত্রে তাঁর ইজতিহাদি ভুল ছিল, ইয়াজিদকে নির্ধারণ করা। যদিও তাঁর এ সিদ্ধান্ত রাজতন্ত্র ও পরিবারতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু মুয়াবিয়া রাঃ ভাবতেন, মূল কাজ তথা শরিঅতের শাসন থাকলে রাজতন্ত্রের অবকাশ রয়েছে। কেননা, কুরআন ও সুন্নাহে এর বিপক্ষে কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। তাছাড়া মুয়াবিয়া রাঃ এর নিয়ত বিশুদ্ধ ছিল। উম্মতকে বিশৃঙ্খলা ও গৃহযুদ্ধ থেকে মুক্ত রাখাই তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল।

সেসময় মক্কা-মদিনার বেশ কয়েকজন সাহাবী এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। এ কথা সত্য যে, সেসময় যোগ্যতাসম্পন্ন বড় বড় সাহাবী থাকা সত্ত্বেও ইয়াজিদের মত কম বয়সী, কম যোগ্যতার ব্যক্তিকে খলীফা নিযুক্তকরণ দৃষ্টিকটু বটে। কিন্তু ইয়াজিদের মধ্যে তখন এমন কোন কিছু প্রকাশিত ছিল না, যার কারণে মুয়াবিয়া রাঃ তাকে অযোগ্য মনে করবেন।

ইয়াজিদকে পরবর্তী খলীফা নির্ধারণের কারণ

সেসময় উল্লেখযোগ্য সাহাবিদের মধ্যে হযরত হুসাইন রাঃ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাঃ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাঃ, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রাঃ সহ কিছু সাহাবীগণ ইয়াজিদকে পরবর্তী খলীফা হিসেবে নিয়োগের বিরোধিতা করেন। তাদের মতামত এই ছিল যে, এভাবে নিজের সন্তানকে নীতি বিরোধী। এটি ইসলামে রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজতন্ত্রের সূচনা তৈরি করে।

ইয়াজিদের নেতৃত্বের যোগ্যতা ছিল না, কিংবা সে ফাসেক, পাপাচারী এমন অভিযোগ কেউ করেননি। বরং তাঁর চেয়ে উত্তমরা তখন বেঁচে ছিলেন এবং এমন সিদ্ধান্ত পূর্ববর্তী খলীফারা করেননি সেটাই দ্বিমতের মূল কারণ ছিল। কেননা বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবিঈনদের এক বিশাল জামাত তখনো বিদ্যমান ছিলেন যারা খিলাফতের দায়িত্ব ও মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব প্রদানে ইয়াজিদের চেয়ে অনেক বেশী যোগ্য ছিলেন।

ইয়াজিদকে খলীফা নির্ধারণের কিছু কারণ নিম্মোক্ত আলোচনা থেকে জানা যেতে পারে-

১। আল্লামা ইবনে খলদুন রহঃ এ বিষয়ে পর্যালোচনা করতে গিয়ে লিখেন,

"যে বিষয়টি মুয়াবিয়াকে রাঃ নিজের ছেলে ইয়াজিদকে পরবর্তী খলিফা বানানোর প্রতি উদ্বদ্ধ করেছে, তাহল উম্মতের একতা ও ভ্রাতৃত্ব রক্ষা। বনু উমাইয়ার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এতে ঐকমত্ব ছিল। যেহেতু সেসময় বনু উমাইয়ারা তাদের ছাড়া অন্য কার নেতৃত্ব মানতে নারাজ ছিল। তারা কুরাইশের সব চেয়ে শক্তিশালী গোত্র ছিল। উম্মত ছিল ঐক্যবদ্ধ এবং অধিকাংশই তাদের সাথে সম্পৃক্ত। এ কারনেই মুয়াবিয়া ইয়াজিদকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তিনি উত্তম ব্যক্তিদের (আকাবির সাহাবীগণ) উপর তাদের চেয়ে নিম্ন ব্যক্তিদের (ইয়াজিদ) দিতে ধাবিত হয়েছেন। কারণে এটাই ছিল যে, যেন উম্মতের মাঝে একতা ও ভ্রাতৃত্ব অটুট থাকে, যা শরিয়তে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।"

২। ইয়াজিদের চরিত্রে বদান্যতা, সহনশীলতা, বিশুদ্ধভাষিতা, কাব্য রুচি,সাহসিকতা ও প্রশাসনিক দক্ষতা ইত্যাদি কতিপয় গুণ ছিলো। এছাড়া তিনি সেসময় কনস্টান্টিনোপল এর অভিযান এ নেতৃত্ব প্রদান ও হজ্জের আমিরের দায়িত্ব পালন করেন।

৩। উক্ত বিষয়গুলো দ্বারা মুয়াবিয়া রাঃ নিশ্চিত হন যে, পুত্রের মাঝে নেতৃত্বের যোগ্যতা রয়েছে। তখন তিনি খলীফা মনোনয়নের সিদ্ধান্ত নেন এবং কয়েকজনের সাথে পরামর্শও করেন।

সুতরাং ইয়াজিদের বাহ্যিক অবস্থা দেখে এটা মেনে নেয়ার অবকাশ ছিল যে, তিনি খিলাফতের যোগ্য। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি আমল-আখলাক ও যোগ্যতার দিক থেকে তৎকালীন সাহাবাদের থেকে অনেকপিছিয়ে ছিলেন। তাঁর স্বভাবে চঞ্চলতা ও অস্থিরতা

উপস্থিত ছিল। খলীফা পরবর্তী তাঁর কয়েকটি সিদ্ধান্ত দ্বারা তা প্রমাণিত হয়। এছাড়া তিনি বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে অধিক লিপ্ত থাকতেন।

ইয়াজিদের দুর্বলতাগুলোর ব্যাপারে মুয়াবিয়া রাঃ হয়তো আশা করেছিলেন, দায়িত্বের ভার গ্রহণ করলে এই ক্রটিগুলো দূর হয়ে যাবে। এছাড়া তিনি ইয়াজিদের জন্য দুয়া ও তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন। একদিন জুম্মার খুতবায় তিনি ইয়াজিদের জন্য দুয়া করেছিলেন এই ভাবে,

"হে আল্লাহ, যদি তুমি জানো যে, আমি ইয়াজিদকে এ পদের যোগ্য মনে করেই দায়িত্ব দিয়েছি ,তাহলে তুমি তা পরিপূর্ণ করো। আর যদি তুমি জানো যে, আমি মোহাব্বতের কারণে তাকে এ পদে অধিষ্ঠিত করেছি, তাহলে তুমি তা পূর্ণ হতে দিও না।"

এ দ্বারা বুঝা যায় যে, মুয়াবিয়া রাঃ নেক নিয়তে উম্মাহের কল্যাণের জন্যই ইয়াজিদকে নির্ধারণ করেছিলেন।

ইয়াজিদকে মুয়াবিয়া রাঃ অসিয়ত

মুয়াবিয়া রাঃ চেয়েছিলেন, ইয়াজিদ মুসলিম উম্মাহের জন্য একজন উত্তম শাসক হবে। তাই তিনি তাকে নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ও পথ নির্দেশনা দিয়েছিলেন। এ অসিয়তগুলো মুয়াবিয়া রাঃ এর জ্ঞানের গভীরতা, দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও উম্মাহের কল্যাণ কামনার প্রমাণ পেশ করে।

তিনি ইয়াজিদকে বলেন,

“ ১। আল্লাহকে ভয় করবে। আমি তোমার জন্য খিলাফতকে নির্ধারণ করলাম। তোমাকে এর দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে।

২। যদি উত্তমের সাথে থাকো, তাহলে এটি আমার সৌভাগ্য হবে। আর যদি এমনটি না করো, তাহলে সেটি তোমার দুর্ভাগ্য হবে।

৩। মানুষের সাথে নম্র আচরণ করবে।

৪। তোমার ব্যাপারে কোন সমালোচনা ও হীনকর কথা শুনলে, তা উপেক্ষা করে চলবে।

৫। বড় ও সম্ভ্রান্তদের সাথে কঠোরতা করবে না। তাদের সম্মানহানী থেকে নিজেকে দূরে রাখবে এবং তাদেরকে নিজের কাছে রাখবে।

৬। যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সম্মুখীন হবে,তখন প্রবীণ, অভিজ্ঞ, নেক ও পরহেজগার ব্যক্তিদের পরামর্শ নিবে। তাদের মতামতের বিরোধিতা করবে না।

৭। নিজের সিদ্ধান্তের উপর কখনো চাপ প্রয়োগ করবে না। কেননা, শুধু এক মানসিকতা থেকে আসা বিষয় সঠিক হয় না।

৮। নিজের নফসকে পরিশুদ্ধের ব্যাপারে সচেতন থাকবে। মানুষও তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করবে।

৯। মানুষকে আপত্তি করার সুযোগ দিবে না। কেননা, মানুষ মন্দ কথা দ্রুত ছড়িয়ে দেয়।

১০। নিয়মিত জামাতে নামাজ পড়বে।

যদি এই নসিহতগুলো মেনে চলো, তাহলে লোকেরা তাদের উপর তোমার অধিকার বুঝতে পারবে। সেই সাথে তোমার সরকার শক্তিশালী থাকবে।”

মুয়াবিয়া রাঃ এর ইন্তেকাল

বার্ধক্য অবস্থায় মুয়াবিয়া রাঃ আস্তে আস্তে বিছানাগত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর শরীর এত দুর্বল হয়ে গিয়েছিলো যে, কব্জি দুটো শুকনো ডালের ন্যায় হয়ে গিয়েছিল। তাঁর দুই পুত্র তাকে পার্শ্ব পরিবর্তন করে দিতেন। আর তিনি বলতেন, “এরা ওই ব্যক্তিকে ওলটপালট (পার্শ্ব পরিবর্তন) করে দেয়, যে দুনিয়াকে ওলটপালট করে দিতে সক্ষম ছিল।”

তিনি এতোটাই আত্ম-মর্যাদাবান ছিলেন যে, তীব্র অসুস্থতা সত্ত্বেও শাসনের প্রভাব - প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সাধারণ জনগণের মাঝে নিজের বিছানাগত অবস্থার কথা প্রকাশ করেননি। যখন মানুষ তাঁর সাথে দেখা করতে আসতো, তিনি গৃহবাসীদের বলতেন, “ আমাকে সুরমা ও তেল লাগিয়ে হেলান দিয়ে বসিয়ে দাও। কোন আগন্তুক যেন না বসে, দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে চলে যায়।” মানুষ ভেতরে আসে আর তাঁকে হাসিখুশি দেখে বলতে থাকে, আমীরুল মুমিনিন তো ভালই আছেন।

মুয়াবিয়া রাঃ রাসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অত্যন্ত মোহাব্বত করতেন। মৃত্যুর সময়ে তিনি বাড়ির লোকজনকে বলেছিলেন, “রাসুলুল্লাহ সাঃ আমাকে একটি জামা পরিধান করিয়েছিলেন। আমি তা যত্ন করে রেখে দিয়েছি। একবার আমি রাসুলুল্লাহ রাঃ এর নখ কেটে দিয়েছিলাম। সেগুলোও আমি শিশিতে আবদ্ধ করে রেখে দিয়েছি। আমার মৃত্যুর পর আমাকে সেই জামা দিয়ে কাফন দিবে। আর সেই নখ চূর্ণ করে আমার চোখেমুখে ছিটিয়ে দিবে। আশা করি আল্লাহ তা’লা এর বরকতে আমার উপর রহম করবেন।”

তিনি মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সম্পদের অর্ধেক বায়তুল মালের কোষাগারে জমা দিয়েছিলেন। যদি অজান্তে বায়তুল মালের সম্পদ কম-বেশি হয়, তাহলে যেন তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়।

শেষ মুহূর্তে তিনি পরিবারের সদস্যদের বলেন, “ মহান আল্লাহকে সর্বদা ভয় করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তাঁকে হেফাযত করবেন। আর যে আল্লাহকে ভয় করে না, তাঁকে হেফাযত করার কেউ নেই।” এর কিছুক্ষণ পর তিনি দুনিয়া ছেড়ে চলে যান।

একটি বর্ণনা মতে, মুয়াবিয়া রাঃ ৬০ হিজরির ৪ রজব ইন্তেকাল করেন। তাঁকে দামেস্কেই দাফন করা হয়।মুয়াবিয়া রাঃ ২০ বছর শামের গভর্নর এবং ২০ বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।

মুয়াবিয়া রাঃ এর ইন্তেকালের সময় ইয়াজিদ হিমসের হাওয়ারিন দুর্গে ছিল। সংবাদ পাওয়া মাত্র সে দ্রুত রাজধানী দামেস্কে চলে আসে। কিন্তু ইয়াজিদ আসার পূর্বেই মুয়াবিয়া রাঃ এর দাফন সম্পন্ন হয়ে যায়।

ইয়াজিদের খিলাফত

ইয়াজিদ দামেস্কে এসে রাষ্ট্রের সভাসদ ও দেশবাসীর উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দেন। হামদ ও সানার পর শোকবার্তা প্রকাশ করে তিনি বলেন, "নিশ্চয়ই মুয়াবিয়া রাঃ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজন বান্দা ছিলেন। আল্লাহ তাঁর উপর অনুগ্রহ নাজিল করেছেন। তারপর নিজের কাছে নিয়ে গিয়েছেন। তিনি পূর্ববর্তীদের থেকে মর্যাদায় কম হলেও পরবর্তীদের থেকে উত্তম ছিলেন। আমি আল্লাহর কাছে তাঁর পক্ষে সাফাই গাইছি না। কেননা তাঁর ব্যাপারে আল্লাহ তা'লাই ভালো জানেন। যদি তাঁর ক্ষমা হয় তাহলে তা আল্লাহর রহমত। আর যদি পাকড়াও হন, তাহলে তা নিজ পদস্খলনের কারণে। তারপর জিম্মাদারি আমাকে দেওয়া হয়েছে। কোনো কিছুর অন্বেষণে আমি ব্যথিত নই এবং কোনো কিছুর বর্জনে আমি কৈফিয়ত দানকারী নই। কিন্তু আল্লাহ তা'লা যা মনজুর করেন তাই হয়।" ইয়াজিদের এই বক্তব্য প্রমাণ করে যে, খলীফা হওয়ার সময় তিনি ফাসেক ছিলেন না, যা আমভাবে মনে করা হয়।

মুয়াবিয়া রাঃ এর সময়ে কুফায় নুমান বিন বশির, বসরায় উবাদুল্লাহ বিন যিয়াদ এবং মদিনায় ওলিদ বিন উতবা গভর্নর ছিল। ইয়াজিদ তাদেরকে স্বপদে বহাল রাখেন। এটি তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

দায়িত্ব গ্রহণের পর ইয়াজিদ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে মুয়াবিয়া রাঃ এর ইন্তেকাল এবং নিজের খিলাফতের বায়আত গ্রহণের জন্য বার্তাবাহক প্রেরণ করে।

হুসাইন রাঃ ও আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর বায়আত না হওয়ার কারণ

মুয়াবিয়া রাঃ এর শাসনামলেই ইয়াজিদকে ‘পরবর্তী খলীফা’ নির্ধারণের ব্যাপারে হুসাইন রাঃ এবং তাঁর সাথে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর অবস্থান এই ছিল যে, পারিবারিক রাজতন্ত্র পরিহার করে, খুলাফায়ে রাশেদিনের জামানার ন্যায় শুরায়ে নিজামে খলিফা নির্ধারণ পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। আর এ দায়িত্ব উম্মাহের সেরা এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের অধীনে হওয়া উচিত।

তাদের উভয়ের ইয়াজিদের কাছে বায়আত না হওয়ায় কারণ এটাই ছিল। এ বিষয়টি ‘ছাড় দেয়া’ হিসেবে করার সুযোগ ছিল। কিন্তু এর দৃঢ়তা এটাই ছিল যে, পৈতৃক সূত্রে পাওয়া খিলাফতের এ পদ্ধতি বাতিল করার চেষ্টা করা। পরবর্তীতে যাতে এ নিয়ে ফিতনা শুরু নাহয়। তাঁরা উভয়ে এ সিদ্ধান্তের উপর আমল করে ইয়াজিদের হাতে বায়আত হওয়া থেকে বিরত ছিলেন।

এমন কোন বিশুদ্ধ বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, হুসাইন রাঃ ইয়াজিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চেয়েছিলেন। বরং প্রাথমিকভাবে হুসাইন রাঃ ও আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর মানসিকতা ছিল যে, তাঁরা ইয়াজিদের বায়আত হবেন না। অথচ বর্ণিত আছে যে, মুয়াবিয়া রাঃ এর শাসনামল থেকেই হুসাইন রাঃ এর কাছে কুফা থেকে পত্র আসতো যে, তিনি যেন সেখানে চলে যান এবং উম্মতের দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেন। কিন্তু হুসাইন রাঃ সেসব পত্রের জবাব দিয়েছেন বা যেতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন - এমন কোনো বিশুদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ইয়াজিদ খলিফা হওয়ার পরও হুসাইন রাঃ কুফায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেননি। পুরো জীবন মদিনায় কাটিয়ে দিতে চেয়েছেন। সেই সাথে নিজের ফাতোয়া অনুসারে ইয়াজিদের হাতে বায়আত হওয়া থেকে বিরত থাকতে মনস্থির করেছিলেন। কিন্তু ইয়াজিদ যখন বায়আতের জন্য চাপ সৃষ্টি করলো, তখন তিনি বাধ্য হয়ে মদিনা ছাড়লেন এবং কুফা যাওয়ার ব্যাপারে ভাবতে লাগলেন।

ইয়াজিদের রাজনৈতিক ভুল পদক্ষেপ

ইয়াজিদ তাঁর খেলাফতে প্রথম যে মারাত্মক ভুল করেছিলো, তা হল সে মুরুব্বি ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের দ্রুত বায়আত গ্রহণ করতে চাপ তৈরি করে। ইয়াজিদের উচিত ছিল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে যারা বায়আত হতে চাননি, তাদের বিষয়ে নাক না গলানো। হযরত আলী রাঃ এর শাসন আমলেও বায়আত হতে না চাওয়া নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের তিনি কোন চাপ দেননি। বায়আত না হওয়া ব্যক্তিদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেননি। সম্মান প্রদর্শনে কোন কমতি করেননি।

তেমনি মুয়াবিয়া রাঃ এর জামানায় ইয়াজিদকে পরবর্তী খলীফা নির্ধারণ করায় যারা অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, তাদের সাথে কঠোরতা করেননি। তাদের প্রতি বিরূপ ছিলেন না।

ইয়াজিদ এই পদক্ষেপের মাধ্যমে তাঁর মরহুম পিতার মূল্যবান অসিয়তকে অগ্রাহ্য করে, যাতে ছিল, " বড় ও সম্ভ্রান্তদের সাথে কঠোরতা করবে না। তাদের সম্মানহানী থেকে নিজেকে দূরে রাখবে।" এই অসিয়তকে ভুলে গিয়ে ইয়াজিদ মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে খারাপের দিকে মোড় নেয়।

বর্ণিত আছে, ইয়াজিদ দায়িত্ব গ্রহণের পর মুয়াবিয়া রাঃ এর আযাদকৃত গোলাম রুযাইককে মদিনার গভর্নর ওলিদ বিন উতবার নিকট প্রেরণ করে এবং নির্দেশ দেয় ওলিদ যেন হুসাইন রাঃ এবং আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরকে নিজের কাছে ডেকে নেয় এবং তাদের থেকে বায়আত গ্রহণ করে। এ বার্তাবাহক মুয়াবিয়া রাঃ এর ইন্তেকালের সংবাদও নিয়ে যায়।

বার্তাবাহক যখন মদিনায় পৌঁছে তখন রাত হয়ে যায়। সে অনেক কষ্টে গভর্নর ওলিদ বিন উতবার সাথে দেখা করে এবং গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি জানায়। ওলিদ সংবাদ পাওয়ায় সাথে সাথেই হুসাইন রাঃ এবং আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরকে রাঃ তলব করে।

আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের এবং হুসাইন রাঃ এর মক্কা থেকে মদিনা রওনা

গভর্নর ওলিদ এর দরবারে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের এবং হুসাইন রাঃ উপস্থিত হওয়ার পর তিনি তাঁদেরকে বায়আত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ জবাবে বলেন, "এটি বায়আত হওয়ার কোন সময় না। তাছাড়া আমার মত ব্যক্তি একাকী লুকিয়ে বায়আত হতে পারে না। মিম্বরে বসে সকলের সামনে আমার বায়আত গ্রহণ করুন।" ওলিদ বিন উতবা নরম স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনি আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর যুক্তিকে সঠিক মনে করে আগামীকাল বায়আত নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তখন হুসাইন রাঃ কে বায়আত হওয়ার জন্য চাপ দিলেন না। উভয়কে বায়আত হওয়ার ছাড়াই যাওয়ায় অনুমতি দিলেন। তবে খবর রাখার জন্য লোক নিয়োজিত করলেন।

তাঁরা উভয়ে বুঝে গেলেন বায়আত না হলে তাদের উপর রাষ্ট্রপক্ষ থেকে কঠোরতা আসবে। তাই রাতের অন্ধকারে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ একটি অপ্রসিদ্ধ রাস্তা দিয়ে মদিনা থেকে মক্কার পথে রওনা দিলেন। সকালে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর অনুপস্থিতির খবর পেয়ে ওলিদ বিন উতবা তাঁর খোঁজে ৩০ বা ৮০ জন ঘোড়সওয়ার প্রেরণ করলেন। কিন্তু তাঁরা আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর কোন খোঁজ পাননি।

এক দুইদিন পর হুসাইন রাাঃ তার পরিবার নিয়ে মদিনা থেকে মক্কা রওনা দেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। মদিনা থেকে মক্কাকে নিরাপদ আশ্রয় মনে করার কারণ এই ছিল যে, মক্কা পবিত্র শহর। রাষ্ট্রপক্ষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে উক্ত পবিত্র ভূমির পবিত্রতা নষ্ট করার সাহস করবে না। দামেস্ক থেকে মদিনা কাছে। কিন্তু মক্কা দূরএ। তাছাড়া মদিনার তুলনায় মক্কা ছিলো পাহাড়ে ঘেরা শহর। এখানে সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এসকল কারণে হুসাইন রাঃ এবং আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ মদিনা ছেড়ে মক্কায় যাওয়াকে অধিক নিরাপদ মনে করলেন।

হুসাইন রাঃ মক্কা রওনা দেয়ার পূর্বে আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ এর সাথে দেখা করলেন। ইবনে উমর রাঃ পরামর্শ দিলেন তিনি যেন কোথাও না যান। কিন্তু হুসাইন রাঃ কুফা থেকে পাওয়া পত্রগুলো দেখালেন। পত্রগুলো দেখে ইবনে উমর রাঃ বললেন, " হুসাইন! আপনি তাদের কাছে যাবেন না।" কিন্তু হুসাইন রাঃ কুফাবাসীকে বিশ্বাস করে ইবনে উমরের কথা মানলেন না। ইবনে উমর রাঃ যাবার সময় হুসাইন রাঃ এর গলা জড়িয়ে ধরে অনেক কাঁদলেন। কেঁদে কেঁদে বললেন, "হে শহিদ, তোমাকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করলাম।"

হুসাইন রাঃ মদিনা থেকে মক্কা রওনা দিলন। পথিমধ্যে আব্দুল্লাহ বিন মুতী রাঃ এর সাথে দেখা হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় যাচ্ছেন ?" তখন হুসাইন রাঃ জবাবে বললেন, "আপাতত মক্কা যাচ্ছি। তারপর ভবিষ্যতে কী করবো তা সেখানে গিয়ে ইস্তেখারা করবো।"

এ থেকে বুঝা যায়, হুসাইন রাঃ মক্কা যাওয়ার সময়ও কুফার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেননি। তাছাড়া মদিনা থেকে কুফা কিছুটা কাছে। মক্কা থেকে বেশ দূরে। যদি কুফা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতেন, তাহলে তিনি মক্কা না গিয়ে মদিনা থেকেই খুব সহজে কুফা চলে যেতেন।

প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে, ২৭ বা ২৮ রজব হুসাইন রাঃ মদিনা থেকে মক্কা রওনা হন। তারপর ৩ বা ৪ শাবান তিনি মক্কায় পৌঁছান।

একটি প্রশ্নঃ হুসাইন রাঃ কি রাষ্ট্রদ্রোহী ছিলেন?

হুসাইন রাঃ এর বিরোধিতার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এতোটাই ভারসাম্যপূর্ণ ছিলেন যে, তাঁর কার্যকলাপের উপর রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ তোলার কোন সুযোগ নাই।

তাছাড়া হুসাইন রাঃ ঐ ব্যক্তি যিনি রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সহচর্যে ইমানী শক্তি ও চারিত্রিক উৎকর্ষতা অর্জন করেছেন। তিনি ছিলেন নবির বংশীয়। আলি রাঃ এর মত জ্ঞানী মানুষের সন্তান। এককথায় ইলম, তাকওয়া ও দ্বীনদারিতায় তৎকালীন সময়ে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় ও মহান ব্যক্তিত্ব। এমন ব্যক্তিত্ববান মানুষের ক্ষেত্রে এমন ধারণা মোটেই যুক্তিসংগত নয় যে, তিনি শুধুমাত্র ইয়াজিদের ব্যক্তিগত দুর্বলতার কারণে তার কাছে বায়আত হতে বিরত ছিলেন। বরং এর পিছনে নিশ্চয়ই বড় কোন কারণ ছিল।

হুসাইন রাঃ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, এভাবে পৈতৃকসূত্রে পাওয়া শাসন ক্ষমতার প্রথা যদি চালু হয়ে যায়, তাহলে এটি পরবর্তীতে মুসলিম জাহানের জন্য বিরাট ক্ষতির কারণ হতে পারে। এমনকি ইয়াজিদ ফাসিক, পাপাচারী এমন অভিযোগ হুসাইন রাঃ করেছেন বলে বিশুদ্ধ কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তার মূল বক্তব্য হলো, ইয়াজিদের খলীফা নিযুক্তকরন পদ্ধতি সঠিক নয়।

আর তিনি যেহেতু ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেননি, তাই এখনো খলীফা হিসেবে ইয়াযিদ তার কাছে স্বীকৃত হয়নি। এছাড়া কুফা থেকে যে চিঠি আসছিল, তা দ্বারা সাফ জানা যাচ্ছিল যে, পুরো ইরাকবাসী হযরত হুসাইন রাঃ এর জন্য অপেক্ষমান। এখনো ইরাকে ইয়াজিদের বাইয়াতে খেলাফত পূর্ণতা পায়নি। তারা কেউ ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ

করেনি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইয়াজিদ যেহেতু তখনো পূর্ণ খলীফা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেনি, তাই তার বিরোধীতা রাষ্ট্রদ্রোহীতার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

যেমন ইতোপূর্বে হযরত উসমান রাঃ এর হত্যার বিচার হবার আগে হযরত আলী রাঃ এর হাতে বাইয়াত হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন আম্মাজান আয়শা রাঃ এবং মুয়াবিয়া রাঃ, তালহা ও যুবায়ের রাঃ। বাইয়াত হতে না চাওয়ার ফলে আয়শা রাঃ ও মুয়াবিয়া রাঃ এর বিরোধীতাকে রাষ্ট্রদ্রোহীতা হিসেবে ধরা যায় না।

সেই হিসেবে হযরত হুসাইন রাঃ এর কাছে ইয়াজিদ জোরপূর্বক শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি হিসেবেই প্রতিয়মান হয়। এজন্য হযরত হুসাইন রাঃ এর কাছে পরিস্কার হয় যে,

১. ইয়াজিদ মুসলমানদের ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করে জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছে।

২. ইয়াজিদের খেলাফত এখানো পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সুতরাং এখনি যদি তা রুখে দেয়া যায় এবং পূর্বসূরী খোলাফায়ে রাশেদীনের পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচনের পদ্ধতিকে পুনর্জিবীত করা যায়, তাহলে তা যথার্থ হবে।

হযরত হুসাইন রাঃ এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ তাই নিজের সাধ্যের সবটুকু দিয়ে তাদের দৃষ্টিতে এ মাকরূহ কার্যক্রমকে বন্ধ করাকে নিজের উপর জরুরী বলে মনে করতে লাগলেন। এজন্য নিজের প্রাণকে উৎস্বর্গ করতেও দ্বিধাবোধ করবেন না।

মদীনার পরিস্থিতি এবং ওলিদ বিন উতবাকে বরখাস্তকরণ

হুসাইন রাঃ এবং আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ মক্কা রওনা হয়ে যাবার পর ওলিদ মাসআব বিন আব্দুর রহমান এবং আব্দুল্লাহ বিন মুতী রাঃ কে গ্রেফতার করে জেলে বন্দী করলেন। এরা আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর সমর্থক ছিলেন। মদীনাবাসী হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ এর কাছে আবেদন করলেন যে, প্রশাসন এভাবে কঠোরতা করা থেকে যেন বিরত থাকে। হযরত ইবনে উমর রাঃ পেরেশান হয়ে ওলিদ বিন উতবার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, “ নিজ শাসন প্রতিষ্ঠিত রাখতে হকের উপর অটল থাকো, জুলুম করো না। যাদের গ্রেফতার করেছো তারা নির্দোষ। তাদের ছেড়ে দাও।”

ওলিদ বিন উতবা জানালো আমীরুল মু'মিনীন ইয়াজিদের আদেশ এমনটাই। তাই লঙ্ঘণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। মদীনাবাসী যখন দেখলো যে, আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ এর মত ব্যক্তিত্ব এর সুপারিশ পর্যন্ত ফিরিয়ে দেয়া হল। তখন তারা জেলখানায় হামলা করে বসে।

এর ফলে আব্দুল্লাহ বিন মুতী মুক্ত হয়ে মক্কায় চলে যান। আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর সাথে গিয়ে মিলে যান।

হুসাইন রাঃ এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাঃ এর মদীনা থেকে বের হয়ে যাওয়ায় ইয়াজিদের চিন্তা বেড়ে যায়। তাদের বাইয়াত নিতে অকৃতকার্য হবার সমস্ত দায়ভার ওলিদ বিন উতবার উপর চাপিয়ে তাকে বরখাস্ত করে দেন। তার স্থলে আমর বিন সাঈদকে নিয়োগদান করেন। সে কঠোর স্বভাবের অধিকারী বলে প্রসিদ্ধ ছিল। আমর বিন সাঈদ রমজানে মদীনা আগমন করে।

সে ঘোষণা দেয়, যেখানে তারা আশ্রয় নিয়েছেন সেই স্থানে হামলা করবে। কিন্তু তার জন্য হামলা করার সুযোগ ছিল না। কারণ, শাওয়াল মাস নিকটবর্তী। হাজীদের কাফেলা মক্কায় আগমনের অপেক্ষমান। এমতাবস্থায় হজ্বের মওসূম শেষ হওয়া এবং হাজীদের ফিরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া ইয়াজিদ প্রশাসনের আর কোন উপায় ছিল না।

হুসাইন রাঃ এর কুফায় যাবার সিদ্ধান্ত

এই পরিস্থিতি নিয়ে হুসাইন রাঃ এবং আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর মাঝে দফায় দফায় পরামর্শ হয়। অবশেষে তারা এ সিদ্ধান্ত নেন যে, একটি স্থানকে কেন্দ্র বানিয়ে নিজেদের মেহনত চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কেন্দ্র কোন স্থানকে বানানো হবে? এ বিষয় নিয়ে উভয়ের মাঝে মতভেদ দেখা দেয়। আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর মত ছিল এই যে, মক্কাকে বানানো হোক। কারণ, মক্কাই সব'চে নিরাপদ। মক্কা পুরো মুসলিম জাহানের ঈমানী কেন্দ্রভূমি। মক্কায় যেমন সাহায্যকারী নিজেদের গোত্র কুরাইশরা রয়েছে, তেমনি মুত্তাকী পরহেযগারদের এক বড় জামাতও বিদ্যমান।

কিন্তু হুসাইন রাঃ এর কাছে ইরাক থেকে একের পর এক পত্র এবং প্রতিনিধি দল আসছিল। যারা হুসাইন রাঃ এক সর্বাত্মক সহযোগিতা করার আশ্বাস দেয়ায় তিনি ইরাক যাবার দিকেই মনস্থির করছিলেন। ইরাকে যাবার পেছনে হুসাইন রাঃ এর প্রথম কারণ এই ছিল যে, আন্দোলনে সাধারণ মানুষের জানমাল হেফাযত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হেযাজের তুলনায় ইরাকে তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা বেশি থাকায় শক্তিও বেশি থাকবে।

দ্বিতীয়ত হুসাইন রাঃ নিজের জানের চেয়ে পবিত্র নগরীর পবিত্রতাকে রক্ষা করাকে বেশি জরুরী মনে করলেন। হুসাইন রাঃ জানতেন যে, এখন হজ্জ চলছে বলে তার উপর হামলা করা বন্ধ আছে। কিন্তু হজ্জ শেষ হতেই তার উপর আক্রমন করা হবে। তাই তিনি পবিত্র নগরীকে রক্তপাত থেকে রক্ষা করতে মক্কা ছেড়ে কুফায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। মক্কায় থাকাকালীন আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ কে বললেন, " যদি আমাকে অন্য কোথাও হত্যা করা

হয়, তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমার কাছে এটা সহনীয় নয় যে, আমার কারণে পবিত্র নগরীর পবিত্রতা বিনষ্ট হোক।”

সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ইয়াজিদের বায়আত গ্রহণ

কার্যক্রম প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে থাকলেও সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীগণের একটি দল বাইয়াত হয়েছিলেন। যার কারণ হলো, তাদের মাঝে একদল হযরত মুয়াবিয়া রাঃ এর দলীল ও ইজতিহাদের সাথে একমত ছিলেন। আর একদল শরীয়তের একটি হুকুম উপর আমল করে বাইয়াত হন। সেটি হল, "একতা ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখো। পরস্পর বিভক্ত হয়ো না।”

এই হুকুমটি পালনের জন্য অনেকেই নিজের অবস্থান থেকে সরে গিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনুত্তম বস্তুকে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই থেকে নেতৃস্থানীয় সাহাবা ও তাবেয়ীগণ ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে উম্মতকে একতাবদ্ধ রাখতে ভূমিকা রাখেন। আরেকটি কারণ ছিল এই যে, সেসময় ইয়াজিদের বিষয়ে কোন খারাপ ধারণা কারো ছিল না। তার চরিত্রে যে কালোদাগ অঙ্কিত হয় তা প্রকাশ পায় খলীফা হবার পর। সে ছিল একজন সেনানায়ক। হজ্জের আমিরের দায়িত্বপালনকারী। একজন সাহাবীর সন্তান। তাবেয়ী। এইসব গুণাবলীর দিকে তাকিয়ে অনেক সাহাবা ও তাবেয়ীগণ ভালো কিছুই হবে সেই আশায় তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। এছাড়া নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি হাদীস রয়েছে-

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “তোমরা শোন ও আনুগত্য প্রকাশ কর, যদিও তোমাদের উপর এমন কোন হাবশীকে আমীর নিযুক্ত করা হয় যার মাথা কিসমিসের মতো।” (সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৬৯৩)

এ হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে, যখন কোন খলীফা যেভাবেই হোক যদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহলে তাকে মেনে নেয়া উচিত। যদিও সে দেখতে কুৎসিত হোক না কেন।

ইয়াজিদের প্রতিনিধি যখন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ এর কাছে বাইয়াত নেবার জন্য মক্কা আসে, তখন তিনি উপস্থিত সবাইকে বলেন, " আল্লাহর কসম! মুয়াবিয়া তার আগের খলীফাদের মত ছিল না। কিন্তু এরপর তাঁর মতো আর কেউ আসবে না। নিশ্চয়ই ইয়াজিদ তাঁর নেক পরিবারের সন্তান। সুতরাং আপনারা সবাই স্বীয় স্থানে আরাম করে বসে থাকুন। ইয়াজিদের বাইয়াত করে তার আনুগত্ব করুন।” তারপর তিনি নিজেও বাইয়াত হন।

হযরত আব্দল্লাহ উমর রাঃ এর অবস্থান এই ছিল যে, যদি সবাই বাইয়াত হয়ে যায়, তাহলে তিনিও বাইয়াত হয়ে যাবেন। তাই তিনি যখন দেখলেন যে, অধিকাংশরাই বাইয়াত হয়ে

গেছেন, তখন তিনিও বাইয়াত হয়ে যান। তিনি তার বাইয়াত হবার সময় বলেন, "যদি এর মাধ্যমে ভালো হয়, তাহলে আমি রাজি, আর যদি ক্ষতি হয়, তাহলে আমরা ধৈর্যধারণ করবো।”

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের প্রতি ইয়াজিদের পত্র এবং হুসাইন রাঃ এর প্রতি কুফাবাসীর পত্র

হযরত হুসাইন রাঃ মক্কায় অবস্থান করছিলেন। সে সময় আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ এর কাছে ইয়াজিদ একটি পত্র প্রেরণ করে। যার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, সে হুসাইন রাঃ এর কার্যক্রম বিষয়ে নজর রাখছিল। তার থেকে বিদ্রোহের আশংকা করছিল। পত্রে ইয়াজিদ লিখে যে,

" হুসাইন রাঃ এর নিকট পূর্ব থেকে লোকজন এসে তাকে খিলাফতের আশা দিচ্ছে। আপনি অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত অভিজ্ঞ মানুষ। যদি হুসাইন রাঃ এমন করেন, তাহলে আত্মীয়তার বন্ধন ছিড়ে যাবে। আপনি বংশের বড় এবং সম্মানিত ব্যক্তি। আপনি তাকে এ বিদ্রোহ থেকে বাঁধা প্রদান করুন।"

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ উত্তরে লিখলেন, " আমার প্রত্যাশা যে, হুসাইন রাঃ এর গমণ এমন কোন কাজের জন্য হবে না, যা আপনার জন্য অসন্তুষ্টির কারণ হবে।”

মোটকথা, দামেশক প্রশাসনের কাছে হুসাইন রাঃ এর বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হুসাইন রাঃ এর যোগাযোগ কুফার জনগণের সাথে হওয়ায় ইয়াজিদের ভয় হয় যে, তারা সম্মিলিতভাবে বিদ্রোহ করে বসবে।

এদিকে কুফাবাসীরা অসংখ্য চিঠি হুসাইন রাঃ এর কাছে প্রেরণ করে। যার মূল বক্তব্য ছিল-পুরো ইরাক ইয়াযিদের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত। কুফাবাসী হুসাইন রাঃ এর সহযোগিতায় প্রস্তুত। শুধুমাত্র চিঠি পাঠিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি কুফাবাসী। চিঠির সাথে প্রতিনিধিদলও প্রেরণ করছিল হুসাইন রাঃ কে কুফায় আগমনের প্রতি উদ্বদ্ধ করার জন্য।পত্রাবালীর বিবরণ এবং প্রতিনিধিদলের বক্তব্য জানাচ্ছিল যে, হুসাইন রাঃ দ্রুত ইরাক এসে পরিস্থিতি সামাল না দিলে পুরো ইরাকে ব্যাপক গণ্ডগোল শুরু হয়ে যাবে। কারণ, এখানকার বাসিন্দারা অধৈর্য হয়ে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসবে। ফলে রক্তের বন্যা বইবে পুরো ইরাকে।

হুসাইন রাঃ চিন্তা করলেন যে, যদি তাদেরকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে তারা নিজেদের কম বুদ্ধির কারণে অনর্থক রক্তক্ষয়ী কোন সংঘর্ষের জন্ম দিতে পারে। তাই তাদের নেতৃত্ব দিয়ে তাদেরকে একতাবদ্ধ করে কম ক্ষতির মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভব হবে। এ কারণেই তিনি বিপদকে সামনে নিয়ে ইরাকে যাওয়াই উপযোগী মনে করলেন। তিনি আশাবাদী ছিলেন যে, ইরাকে আসলে, সেখানকার জনগণকে নিয়ে তার নেতৃত্বে একটি বড় বাহিনী হবে। একদিকে ইরাকের বিশাল জনগোষ্ঠি, অপরদিকে হেযাজে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর নেতৃত্বে জনসাধারণের বিরাট জামাত। দুইদিক থেকেই বিশাল জনতার একতবদ্ধ অবস্থান দেখে ইয়াযিদ প্রশাসন হয়তো তাদের রাষ্ট্রনীতির পদ্ধতি পরিবর্তন করে খোলাফায়ে রাশেদীনের তরীকায় রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতিতে ফিরে যেতে বাধ্য হবে। তাহলে কোন প্রকার রক্তপাত ছাড়াই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে।

মুসলিম বিন আকীলকে কুফায় প্রেরণ

হুসাইন রাঃ কুফার লোকদের কৃত অঙ্গিকারভঙ্গের সম্ভাবনা এবং ইয়াযিদ প্রশাসনের কঠোরতার ব্যাপারে ভালো করেই জানতেন। যেহেতু ইরাকবাসী তার সাথে গাদ্দারী করতে পারে এ কারণেই তিনি ইরাক রওনা হবার বিষয়ে তাড়াহুড়া করেননি। বরং খোঁজখবর নিয়ে ধীরে সুস্থ্যে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যাচাই করার জন্য তিনি নিজে না গিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আকীলকে প্রেরণ করে পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চান।

মুসলিম বিন আকীল কুফায় আসলেন। কুফাবাসীরা তাকে বরণ করে নেয়। তাঁর হাতে অল্প কয়েক দিনে প্রায় আঠারো হাজার লোক হুসাইন রাঃ এর নামে বাইয়াত হয়।এতে করে মুসলিম বিন আকীল বুঝেন যে, তারা পত্রে যা লিখেছে এবং লোক পাঠিয়ে যা কিছু বলছে, এ সব কিছুই সত্য। তারা হযরত হুসাইন রাঃ এর জন্য জান দিতে প্রস্তুত। আর কুফায় এখনো ইয়াজিদের খিলাফত পূর্ণতা পায়নি। অধিকাংশ লোক ইয়াজিদের খিলাফতের বিরোধী। কিন্তু আসলে এসবই ছিল তাদের প্রতারণা। তাদের মূল মাকসাদ ছিল যেন হুসাইন রাঃ কুফায় আসেন। আর তারা তাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে।

কুফায় তখন ইয়াজিদের খেলাফত মজবুত হয়ে গিয়েছিল। গভর্নর ছিল নুমান বিন বশীর রাঃ। তিনি মুসলিম বিন আকীলের আগমণ এবং বাইয়াত সম্পর্কিত বিষয় জানার পরও কোন এ্যাকশনে যাননি। তিনি মুসলিম বিন আকীলের সাথীদের বলেন, 'আমি সন্দেহের বশে তোমাদের গ্রেফতার করবো না। তবে যদি একথা জানতে পারি যে,

তোমরা খলীফার বাইয়াত ভেঙ্গেছো, এবং রাষ্ট্রদ্রোহ করছো, তাহলে আল্লাহর কসম! আমি তলোয়ার ব্যবহার কতে কুণ্ঠিত হবো না'।
একজন গভর্নর হিসেবে নুমান বিন বশীর নিশ্চয়ই মুসলিম বিন আকীলের যাবতীয় কার্যক্রম নজরে রাখছিলেন। কিন্তু তারপরও মুসলিম বিন আকীলকে গ্রেফতার না করা একথাই প্রমাণ করে যে, নুমান বিন বশীর এর কাছে মুসলিম বিন আকীলের কার্যক্রমকে রাষ্ট্রদ্রোহ বলে মনে হয়নি। যদি এমন কিছু হতো, তাহলে তিনি অবশ্যই এ্যাকশনে যেতেন।

হুসাইন রাঃ এর কুফা যাওয়ার প্রস্তুতি ও আত্মীয়-স্বজনদের বাঁধা প্রদান

মুসলিম বিন আকীল কুফাবাসীর প্রতারণা বুঝতে না পেরে তাদের বাহ্যিক উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা ও সহযোগিতা দেখে খুশি হয়ে পত্র প্রেরণ করেন হুসাইন রাঃ এর কাছে। যাতে তিনি জানান যে, “কয়েক হাজার লোক আমার হাতে বাইয়াত হয়ে গেছে। কুফার পরস্থিতি সন্তোষজনক। আপনি দ্রুত কুফায় চলে আসুন।”
হুসাইন রাঃ এর কাছে মুসলিম বিন আকীলের পত্র আসতেই তিনি কুফায় রওনার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। এ সফরে বড় সাহাবাগণ এবং তাঁর নিকটাত্মীয়গণ যথাসম্ভব কুফায় যেতে বারণ করতে থাকেন।
আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ এবং আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ খুব বুঝালেন যে, মক্কার বাইরে যাবেন না। কুফায় যাবার ইচ্ছে পরিত্যাগ করুন। এটাকে একটা ষড়যন্ত্র মনে হয়। যেভাবে আপনার পিতা আলী রাঃ কে ওরা হত্যা করেছে কুফাবাসী। ওরা আপনার বাবা ও ভাই হাসান রাঃ এর সাথে গাদ্দারী করেছে ওরা। এমনিভাবে আপনার সাথেও এরা গাদ্দারী করবে।
তারা উভয়ে খুব বুঝালেন। যেভাবে তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান গনী রাঃ কে তার পরিবারের সামনে হত্যা করা হয়েছে। না জানি ওরাও আপনাকে আপনার পরিবারের সামনেই হত্যা করে। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/৩০৩]
আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ একথা বলতে থাকেন যে, যদি আমি বুঝতাম যে, আমি বাঁধা দিলে তুমি যাবে না, তাহলে আমি তোমার মাথা ও দাড়ি ধরে বাঁধা দিতাম।
তারপর তিনি দৌড়াতে দৌড়াতে হুসাইন রাঃ এর ঘোড়ার লাগাম ধরে বললেন, যদি আপনি যেতেই চান, তাহলে অন্তত সন্তান সন্তুতি এবং পরিবারের সদস্যদের রেখে যান। তাদের এ বিপদের মুখে নিয়ে যাবেন না।

হুসাইন রাঃ এর ভাই মুহাম্মদ বিন আলী হানফিয়্যাহ ও সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন ভাইকে সফরে বাঁধা দিতে। হুসাইন রাঃ এর চাচাতো ভাই এবং বোন জামাতা আব্দুল্লাহ বিন জাফর রাঃ সর্বোচ্চ চেষ্টা করেলন হুসাইন রাঃ কে কুফায় যেতে বাঁধা দিতে।

আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ হুসাইন রাঃ কে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছো, তুমি কি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছো, যারা তোমার পিতাকে হত্যা করেছে আর তোমার ভাইকে অপবাদ দিয়েছে। তখন তিনি বললেন,”যদি আমাকে অন্য কোথাও হত্যা করা হয়, তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমার কাছে এটা সহনীয় নয় যে, আমার কারণে পবিত্র নগরীর পবিত্রতা বিনষ্ট হোক।”

সকলেই হুসাইন রাঃ কে বাঁধা দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু হুসাইন বিন আলী রাঃ নিজের সিদ্ধান্তে অনড় রইলেন। তিনি একথা বুঝাতে পারছিলেন যে, কুফা যাওয়া ছাড়া এ সমস্যার সমাধান হবে না। এছাড়া জোরপূর্বক ইয়াযিদের নামে বাইয়াত নিতে চাইলে যে মতানৈক্য তৈরী হবে এতে করে পবিত্র শহরে রক্তপাতের সম্ভাবনা আছে। তাই তার কাছে ইজতিহাদ অনুপাতে দৃঢ়তার উপর অটল থাকাকে যথার্থ বলে মনে হয়েছে।

বর্ণিত আছে, পরিবারসহ তিনি জিলহজ্ব মাসের ৮ তারিখ অথবা তাঁর কিছুদিন আগে মক্কা থেকে কুফার উদ্দেশ্যে রওনা হন। সঙ্গী ছিলেন পরিবারের ৮২ সদস্য এবং কুফার ৬০ জন । তিনি যাবার সময় সাথে কুফাবাসীদের লিখিত পত্রও নিয়ে নেন।মক্কা থেকে কারবালার দূরত্ব ত্রিশ মনজিল। সেই জমানায় মনজিল ছাড়া এদিক সেদিক বিরতি দেয়া হতো না। সেই হিসেবে কাফেলা প্রতিদিন এক মনজিল সফর করতো। এভাবে সফর করে দশে মুহাররমে কারবালা প্রান্তরে পৌঁছে যান।

কুফায় নতুন গভর্নর নিয়োগ ও মুসলিম বিন আকীলকে হত্যা

মুসলিম বিন আকীলের পত্র হুসাইন রাঃ এর কাছে পৌঁছতে তিন-চার সপ্তাহ লেগে যায় । এর মাঝে কুফার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, যে ব্যাপারে হুসাইন রাঃ কিছুই জানতেন না। ঘটনা হল, কুফার কিছু লোক মুসলিম বিন আকীলের ব্যাপারে নুমান বিন বশীর রাঃ এর কোমল আচরণ পছন্দ করছিল না। তারা ইয়াযিদের কাছে এ বিষয়ে নালিশ দিয়ে চিঠি পাঠায়। বানোয়াট কথা বলে ইয়াজিদকে ক্ষিপ্ত করে। ইয়াযিদ তাদর কথায় প্রলুব্ধ হয়ে নুমান বিন বশীরের মত বয়োজেষ্ঠ এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বুযুর্গ ব্যক্তিকে বরখাস্ত করে দেয়। বসরার গভর্ণর উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে বসরার সাথে কুফার নতুন গভর্ণর হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করে।

উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ ছিল কঠোর হৃদয়ের অধিকারী এবং দায়িত্ব পালনে ছিল কট্টর। উবায়দুল্লাহ দায়িত্ব পেয়েই বসরা থেকে কুফায় চলে আসে। এ সময় মুসলিম বিন আকীল শহরের এক সরকারী আমীর হানী বিন উরওয়াহ এর ঘরে ছিলেন। উবায়দুল্লাহ গোয়েন্দা মারফত এ সংবাদ জানতেই হানী বিন উরওয়াহকে ডেকে পাঠান।

জিজ্ঞাসাবাদে তিনি মুসলিম বিন আকীল কোথায় তা বলতে অস্বিকৃতি জানান। এতে উবায়দুল্লাহ ক্ষীপ্ত হয়ে তাকে জেলে বন্দী করেন।

এ পরিস্থিতিতে মুসলিম বিন আকীলও একটি মারাত্মক ভুল করে বসেন। যার ফলে পুরো ঘটনাই পাল্টে যায়। তিনি তার মেজবান হানী বিন উরওয়াহকে জেল থেকে উদ্ধার করতে অস্ত্রসহ চার হাজার লোক নিয়ে ময়দানে নেমে আসেন। যখন এ বিশাল বাহিনী নিয়ে গভর্নর ভবনের দিকে রওনা হন তখন শুরুতে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু দ্রুতই কুফার পুরানো প্রতারণার অভ্যাস প্রকাশ পেয়ে যায়। মুসলিম বিন আকীল যখন আক্রমণ করতে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন একে একে তার সাথীরা সটকে পড়তে শুরু করে। মা তার ছেলের কাছে, বোন তার ভাইকে, পিতা পুত্রকে এবং ভাই ভাইকে বলতে লাগল, বাড়িতে ফিরে চল। কাল যখন শামের বাহিনী এসে পৌঁছবে, তখন তুমি কিভাবে তাদের হাত থেকে নিস্তার পাবে? তখন লোকেরা মুসলিম বিন আকীলকে অসহায় অবস্থায় রেখে একে একে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে পড়ল এবং দেখা গেল তাঁর সাথে পাঁচশ যোদ্ধা বাকি আছে।

এরপর তাদের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে তিনশত তারপর ত্রিশে দাঁড়াল। তারপর এরাও তাঁকে রেখে চলে গেল। তখন তিনি সম্পূর্ণ একাকী হয়ে পড়লেন। তখন তিনি অজানা গন্তব্যের পথে বেরিয়ে পড়লেন। আর এদিকে অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আসছিল। আর তিনি উদ্দেশ্যহীনভাবে একাকী রাস্তায় পথ চলছিলেন। এভাবে তিনি এক গৃহে এসে উপস্থিত হলেন। করাঘাত করলে ত্বওয়া নামক এক স্ত্রীলোক বের হল, তিনি পানি চাইলেন। পানি পান করে নিজের

পরিচয় দিয়ে বললেন, "হে আল্লাহর বান্দী! এই শহরে আমার কোন বাড়ি ঘর কিংবা স্বজন পরিজন কেউ নেই। তোমার কি আমার প্রতি একটু সদাচার ও অনুগ্রহ করার সুযোগ আছে? যার পুরস্কার আমি পরে তোমাকে দিবো। কুফার লোকেরা আমাকে ধোঁকা দিয়েছে। আমার সাথে মিথ্যা বলেছে।" তখন সে মহিলা নিজ গৃহে মুসলিমকে আশ্রয় দেন। নিরাপদে ঘরে থাকতে দেন।

ত্বওয়ার ছেলে এসে যখন বিষয়টি জানল, তখন পরদিন সকালে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ পর্যন্ত এ খবর জানিয়ে দিল। উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ মুসলিম বিন আকীলকে পাকড়াও করে নির্মমভাবে হত্যা করে লাশ ছাদ থেকে ফেলে দেয়। হানী বিন উরওয়াকেও হত্যা করে।

ইয়াযিদের কাছে হুসাইন রাঃ এর রওনার সংবাদ ও মারওয়ানের পত্র

হেযাজের গভর্ণর আমর বিন সাঈদ হযরত হুসাইন রাঃ এর রওনা হতেই দামেশকে ও কুফায় সংবাদ দিয়ে লোক পাঠিয়ে দেন। তিনি উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে লেখেন যে, হুসাইন রাঃ তোমার দিকে আসছে।

মারওয়ান বিন হাকামও উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে এ সংবাদ পাঠান। তবে সাথে সাথে পত্রযুগে লিখে পাঠান যে, হুসাইন রাঃ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে ফাতিমা রাঃ এর ছেলে। আল্লাহর কসম! আমাদের কাছে হুসাইন রাঃ এর চেয়ে প্রিয় কেউ নাই। খবরদার! এমন কিছু করে বসো না, যে কাজের কোন ক্ষতিপূরণ করা না যায়। আর লোকদের তা ভুলানো না যায়।

মারওয়ান বিন হাকামের উক্ত পত্র দ্বারা বুঝা যায় যে, বনু উমাইয়ার জ্ঞানী গুণী ও লোকেরা হুসাইন রাঃ কে সম্মান ও ইজ্জত করতো। কিন্তু আফসোস হল, উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ এসব জ্ঞানী ও সমঝদার ব্যক্তিদের পরামর্শ কানে নেয়নি। সে ছিল সৈনিকের ছাঁচে গড়া এক যন্ত্রমানব। মারওয়ানের মত বয়োজেষ্ঠ্য আমীরের কথার কোন গুরুত্বও তার কাছে ছিল না।

উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের প্রতি ইয়াযিদের পত্র

সে সময় ইয়াযিদ উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে পত্র পাঠায়। তাতে লিখে যে, "আমার কাছে সংবাদ এসেছে যে, হুসাইন রাঃ কুফার দিকে আসছেন। হুসাইন রাঃ এর বিষয়ে সব সময়ের মাঝে তোমার সময়টা, সকল শহরের মাঝে তোমার শহর, সকল গভর্ণরদের মাঝে তুমিই বড় পরীক্ষার সম্মুখীন। এমন পরীক্ষা পতিত হয়েই লোকেরা উন্নতি অর্জন করে অথবা গোলামদের মত লাঞ্ছিত হয়ে যায়।"

ইয়াযিদ আরো লিখেন, "গোয়েন্দা এবং সশস্ত্র পাহারাদারদের সতর্ক রাখো। যাদেরই সন্দেহ হয় গ্রেফতার করো। যাদের উপর অভিযোগ আছে তাদের পাকড়াও করো। কিন্তু হত্যা কেবল তাকেই করবে, যে তোমার সাথে যুদ্ধ করে। আর আমাকে চলমান সকল কিছু জানাতে থাকবে।" ইয়াযিদের উক্ত পত্র প্রমাণ করে যে, ইয়াযিদ হযরত হুসাইন রাঃ এর কাফেলায় স্বপ্রণোদিত হয়ে কোন প্রকার ধর-পাকড় করতে আদেশ দেননি। বরং যদি অভিযোগ পাওয়া যায়, বা সন্দেহযুক্ত কাজ করে তাহলেই কেবল পাকড়াও করবে। আর তারা যুদ্ধ না করলে তাদের সাথে হত্যার মত কাজ না করতেও নির্দেশ প্রদান করা হয়। ইয়াযিদ হয়তো ইবনে যিয়াদকে এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করেছে। অথচ ইবনে যিয়াদের মত পাথর দিলের মানুষের জন্য এতটুকু বলা যথার্থ ছিল না। ইয়াযিদের উচিত ছিল একথা জানানো যে, যদি খারাপ কিছুর সম্ভাবনা হয়, তাহলে যেন হুসাইন রাঃ কে নিরাপত্তার সাথে তার কাছে দামেশকে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু এভাবে স্পষ্ট কিছু না বলা ইয়াযিদের অপূরণীয় ভুল বলেই প্রতীয়মান হয়।

মুসলিম বিন আকীলকে হত্যা করার পর উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের প্রথম প্রচেষ্টা এই ছিলযে, কুফার অবস্থা সম্পর্কে হযরত হুসাইন রাঃ কে সম্পূর্ণ বেখবর রাখা। এ লক্ষ্যে সে কুফা থেকে বসরা পর্যন্ত এবং শাম পর্যন্ত কড়া মূল রাস্তাগুলোতে কড়া পাহারা বসায়। আরব থেকে আসা কেউ যাচাই বাছাই ছাড়া এ এলাকায় ঢুকতে পারেনি।

মুসলিম বিন আকীলকে জিলহজ্ব মাসের ৮ তারিখ শহীদ করা হয়। সেদিন বা এর কয়েকদিন আগেই হুসাইন রাঃ কুফার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হয়ে পড়েন। ফলে তাঁর এটা জানা ছিল না যে, কুফার গভর্ণর এখন কোমল হৃদয়ের অধিকারী নুমান বিন বশীর রাঃ নয়, বরং পাথর দিলের অধিকারী যন্ত্রমানব উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ। যদি এতোটা কড়া পাহারা না হতো, তাহলে হয়তো মক্কার সীমানা পাড় হবার আগেই হুসাইন রাঃ এর কাছে কুফার প্রকৃত অবস্থা জানা হয়ে যেতো। কিন্তু কড়া চেকিং এর কারণে কেউ এ সংবাদ তাঁর কানে পৌঁছাতে পারেনি। ফলে তিনি তার কাফেলা নিয়ে আগে বাড়তে লাগলেন।

মুসলিম বিন আকীলকে হত্যার সংবাদ

ইরাকের সীমান্তের কাছে এসে হুসাইন রাঃ সংবাদ পান যে, মুসলিম বিন আকীলকে হত্যা করা হয়েছে।

কুফায় এখন নতুন গভর্ণর উবাদুল্লাহ বিন যিয়াদ। সে কঠোরতার সাথে রাষ্ট্রের সাথে বিদ্রোহকারী ও সহযোগীদের দমন করছে। সেই সাথে হুসাইন রাঃ জেনে গেলেন কুফাবাসীদের প্রতারণা সম্পর্কেও। মুসলিম বিন আকীল মুহাম্মদ বিন আশআছকে হুসাইন রাঃ এর কাছে তার পক্ষ থেকে এ সংবাদ জানাতে বলেন যে,

"আপনি পরিবার-পরিজন নিয়ে ফিরে যান। আপনি কুফাবাসীর ধোঁকায় পড়বেন না। কেননা এরাই তারা, যারা নিজেদের আপনার পিতার সাথী পরিচয় দিতো। নিশ্চয় এ কুফাবাসী আপনার পিতার সাথে মিথ্যা বলেছে এবং আমার সাথেও মিথ্যা বলেছে।"

হুসাইন রাঃ ফিরে যেতে মনস্ত করলেন। কিন্তু যখন তিনি ফিরে যাবার প্রস্তুত নিচ্ছেন, তখন মুসলিম বিন আকীলের যে স্বজনরা তার সফরসঙ্গী ছিলেন তারা বলতে লাগলেন: "আল্লাহর কসম ! আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম বিন আকীলের খুনের বদলা না নিবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ফিরে যাবো না। যদিও সবাই শহীদ হয়ে যাই।"

এসব শুনে হযরত হুসাইন রাঃ কুফায় না গিয়ে দামেশকে গিয়ে ইয়াযিদের সাথে সাক্ষাৎ করার মনস্থ করলেন। তিনি এ সিদ্ধান্তে এতোটাই অটল ছিলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ কুফার রাস্তা পাল্টে শামের দিকে রওনা করলেন। বুঝে গেলেন যে, ইয়াযিদের খেলাফত আসলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কুফাবাসীরা তাকে ভুল তথ্য দিয়ে এখানে টেনে এনেছে। তিনি চাইলেন যে, দামেশকে গিয়ে ইয়াযিদের সাথে দেখা করতে। হতে পারে সরাসরি সাক্ষাতে ও আলাপচারিতায় সমাধান হবে।

উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ এর কর্মকাণ্ড

হুসাইন রাঃ এর ইয়াযিদের দিকে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি সঠিক ও যথার্থ ছিল। এ কারণে হুসাইন রাঃ এর শাহাদতের পর ইয়াযিদ বলতেন যে, "আমার কি বিগড়ে যেতো, যদি আমি কিছু কষ্ট সহ্য করে নিতাম। হুসাইন রাঃ কে নিজের ঘরে ডেকে নিতাম। তিনি যা চান তাই নিতে তাকে ক্ষমতা দিতাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয় হবার হক তো ছিল। যদিও তাতে আমার হুকুমতের শক্তি ও শওকত হ্রাসই পেতো।"

হুসাইন রাঃ কুফার রাস্তা রেখে দামেশকের দিকে প্রায় ৪৫ মাইল বা সাড়ে ৭২ কিলোমিটার সফর করে কারবালা নামক স্থানে এসে পৌঁছে গেলেন। যা কুফা থেকে দামেশ্ক যাবার মহাসড়কে অবস্থিত। ফুরাত নদীর নিকটে।

উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ চাইলে হুসাইনী কাফেলাকে দামেশকের দিকে যেতে দিতে পারতো। কিন্তু সে তা করেনি। আফসোসের বিষয় হল, চরম ধৃষ্টতার সাথে সে হুসাইন রাঃ কে দামেশকের দিকে যেতে না দিয়ে গ্রেফতার করে তার কাছে নিয়ে আসার স্পর্ধাসূচক আদেশ জারী করে। প্রশ্ন হল, সে এমনটা করল কেন? তাহলে কি ইয়াযিদের পক্ষ থেকে হুসাইন রাঃ কে এভাবে গ্রেফতার করার নির্দেশ ছিল? বাস্তব কথা হল, হুসাইন রাঃ ইরাক সীমান্তে পৌঁছার পর থেকে দশ মহররম পর্যন্ত কুফা ও দামেশকের মাঝে কোন প্রকার যোগাযোগ ও কথোপকথন করা সম্ভব ছিল না।

কারণ, কুফা ও দামেশকের মাঝে দূরত্ব হল ৯০৪ কিলোমিটার। যদি কোন দ্রুতগামী ঘোড়াও প্রতিদিন একশ' কিলোমিটার সফর করে। তবু দামেশক পৌঁছতে নয় থেকে দশ দিন লেগে যাবে। আবার সেখান থেকে নতুন পয়গাম নিয়ে কুফা আসতেও এমন সময় লাগতো। এর মানে ইয়াযিদের কাছ থেকে কুফায় পয়গাম আসতে কমপক্ষে ৮ কিংবা ৯ দিনের দরকার। অথচ হুসাইন রাঃ ইরাক সীমান্তে আসার পর থেকে কারবালায় হত্যাযজ্ঞ পর্যন্ত ৫দিন সময়ও অতিক্রম করেনি। বরং ১০ই মুহররমই সকলকে শহীদ করে ফেলা হয়।

এর দ্বারা পরিস্কার বুঝা যায় যে, কারবালা প্রান্তরে ইবনে যিয়াদ কর্তৃক হত্যাযজ্ঞে ইয়াযিদের সরাসরি কোন নির্দেশ ছিল না। বরং ইয়াযিদের আগের নির্দেশনা অনুপাতে সব ধরণের পদক্ষেপের জন্য নিজেকে উপযুক্ত মনে করে একক সিদ্ধান্তে সে তা করেছে। নতুন কোন নির্দেশের প্রয়োজন অনুভব করেনি। ইয়াষিদের আগের নির্দেশনা ছিল কুফাকে নিয়ন্ত্রণ করা। আসলে ইবনে যিয়াদের কর্মকান্ড থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, সে একজন কঠোর মানসিকতা সম্পন্ন কমান্ডার ছাড়া কিছু নয়। তার দৃষ্টিতে হুসাইন রাঃ ছিলেন রাষ্ট্রের বিরোধী। এমন অপরাধীকে ক্ষমা করা যায় না। সে যেভাবে মুসলিম বিন আকীল রাঃ এবং হুর বিন উরওয়াকে প্রকাশ্যে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ এটাই চাচ্ছিল যে, হুসাইন রাঃ বেখবর অবস্থায় কুফায় আসবেন আর তাঁকে অপ্রস্তুত অবস্থায় গ্রেফতার করা হবে। এজন্যই সে সীমান্তবর্তী টহল বাহিনীকে অর্ডার দিয়ে রেখেছিল যে, হুসাইন রাঃ আসার সাথে সাথে দ্রুত গ্রেফতার করে যেন তার দরবারে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু হুসাইন রাঃ এ নির্দেশ মানতে অস্বিকার করেন। সেনা কমান্ডার হুর বিন ইয়াযিদ নবী পরিবারের প্রতি মোহাব্বত, তার কোমল হৃদয়ের কারণে হুসাইন রাঃ কে গ্রেফতার না করে চলে যেতে সুযোগ করে দেন।

উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ এবার উমর বিন সা'দকে তেহরানের গভর্নরের দায়িত্ব দেবার আশ্বাস দিয়ে হুসাইন রাঃ কে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেয়। আদেশ করে, যদি হুসাইন রাঃ স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ না করে্ তাহলে যেন হত্যা করা হয়।

হুসাইন রাঃ এর তিনটি প্রস্তাব

হিজরী ৬১ হিজরীর ৯ই মহররম। কারবালা প্রান্তরে সরকারী বাহিনীর অফিসার উমর বিন সা'দ, শিমার বিন জিলজাওশান এবং হুসাইন বিন নুমাইরের সাথে হযরত হুসাইন রাঃ এর আলোচনা হয়। যখন সকল পথ রুদ্ধ হতে দেখলেন তখন হুসাইন রাঃ দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করে তিনটি প্রস্তাব পেশ করেন। যথা-

১. আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানেই ফেরত যাবার সুযোগ দেয়া হোক।

২. ইয়াযিদের কাছে যাবার সুযোগ দেয়া হোক। যেন তার হাতে বাইয়াত হতে পারেন। তাদের ভিতরকার মতভেদ যেন দূর হয়ে যায়।

৩. ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তে পৌঁছে দেয়া হোক। যেন তিনি অন্যান্য মুসলমানদের মতই জীবন যাপন করতে পারেন। উমর বিন সাদ এ প্রস্তাব মেনে নেয়।

উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে এ বিষয়ে জানায়। সে হুসাইন রাঃ এর শান্তি প্রস্তাব বাতিল করে দেয়। শর্ত ছাড়া গ্রেফতার করার জন্য জোর নির্দেশ প্রদান করে।

কিন্তু এভাবে অসহায় আত্মসমর্পণ কেবল নবী পরিবারের অসম্মানই নয়, বরং সেই মহান উদ্দেশ্যও ধুলায় মিশে যায়, যে উদ্দেশ্যে নিজের পরিবারের সদস্য পর্যন্ত ঝুঁকির মুখে নিক্ষেপ করেছেন। এ কারণে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, কিছুতেই তিনি শর্তহীন আত্মসমর্পণ করবেন না।

যুদ্ধের ময়দান

কথাবার্তা শেষ হয়ে যাবার পরও উমর বিন সা'দ যুদ্ধ না করার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ইবনে যিয়াদ কুফায় বসে পুরো পরিস্থিতির সংবাদ রাখছিল। সে কড়া নির্দেশ প্রদান করে জুআইরিয়া বিন বদর তাইমীকে পাঠায় যে, উমর বিন সা'দকে বল যে, দ্রুত হামলা করতে, নতুবা তাকে হত্যা করা হবে।

উমর বিন সা'দ সেদিন সুযোগ দিল হুসাইন রাঃ কে চিন্তা ভাবনা করার জন্য। পরদিন উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কড়া নির্দেশ পাবার পর উমর বিন সা'দ হাতিয়ার নিল এবং যুদ্ধ শুরু করার ঘোষণা দিল।

৬১ হিজরীর মহররম মাসের ১০ তারিখ। শুক্রবার মতান্তরে শনিবার উমর বিন সা'দ তার সঙ্গীদের নিয়ে ফজরের নামায শেষে যুদ্ধের জন্য সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল। উল্লেখ্য যে, সে দিন ছিল আশুরার দিন। এদিকে হুসাইন রাঃ ও তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে নামায পড়লেন। আর তারা ছিলেন বত্রিশজন অশ্বারোহী এবং চল্লিশ পদাতিক যোদ্ধা। এরপর তিনি তাঁদেরকে সারিবদ্ধ করলেন। ডানপাশের কমান্ডার বানালেন যুহাইর বিন কায়সকে আর বাম পাশের জন্য নির্ধারণ করলেন হাবীব বিন মুতাহহারকে। তাঁর ঝাণ্ডা প্রদান করলেন তাঁর ভাই আব্বাস বিন আলীকে। আর তাঁদের সঙ্গের মেয়েদেরকে তাঁবুগুলিতে তাদের পেছনে নিয়ে আসলেন। এদিকে হুসাইন রাঃ এর নির্দেশমত রাতেই তারা তাদের তাঁবুর পেছনে পরিখা খনন করে তাতে জ্বালানি কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি ফেলে রেখেছিলেন। এরপর তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছিল। যাতে করে পেছন থেকে কেউ তাঁবুর কাছে ঘেঁষতে না পারে।

আর উমর বিন সা'দ তাঁর বাহিনীর ডান পার্শের কমান্ডার বানালো আমর বিন হাজ্জাজ । বাম পাশের জন্য শিমার বিন জুলজাওশানকে। অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল আযরাহ বিন কায়স আল আহমাসী। আর পদাদিক বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল শাবীছ বিন রিবয়ীর। আর ঝান্ডা ছিল ওয়ারদানের হাতে।

এসময় কুফার ঘোড়সওয়ার বাহিনীর কমান্ডার হুর বিন ইয়াযিদের বিবেক জাগ্রত হয়ে উঠল। সে সৈন্যবাহিনীর মনোভাব দেখে তিরস্কার করে বলতে লাগল, "তোমরা কি হুসাইন রাঃ এর আবেদন গ্রহণ করবে না? আল্লাহর কসম! যদি এমন দরখাস্ত তুর্কিস্তান ও দায়লামের কাফেররাও করতো, তাহলে তা তোমাদের জন্য রদ করা জায়েজ হতো না।"

এতে করে সৈন্যদের মাঝে কোন প্রভাব সৃষ্টি হয়নি। তখন তিনি বেশ নিজ বাহিনী ছেড়ে হুসাইন রাঃ এর বাহিনীর দিকে এগিয়ে গেলেন। তাদের সাথে শরীক হয়ে গেলেন। তার পূর্ব আচরণের জন্য হুসাইন রাঃ এর কাছে ক্ষমা চাইলেন। বলেন, "আমি যদি আগে তাদের ইচ্ছের কথা জানতাম, তাহলে আমি আপনার সাথে ইয়াযিদের কাছে যেতাম।"

এরপর তিনি বাহিনীর সামনে এসে উমর বিন সা'দকে বললেন, “দুর্ভাগ্য তোমাদের নবীর দৌহিত্রের প্রস্তাবিত তিনটি বিষয়ের একটিও কি তোমরা গ্রহণ করবে না?” তখন সে বলল, “তা গ্রহণ করার ক্ষমতা যদি আমার থাকতো, তাহলে আমি তা গ্রহণ করতাম।”
তারপর যুদ্ধ শুরু হল। হুর বিন ইয়াযিদ উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের বাহিনীর উপর হামলা করলেন। দুইজন সৈন্যকে হত্যা করে নিজেও শহীদ হয়ে গেলেন।

হুসাইন রাঃ কে অপমান

যুদ্ধ চলাকালে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আওয়াজ দিল: তোমাদের মাঝে কি হুসাইন আছে? উত্তর আসল: আছে। তখন সে বলল, তাকে জাহান্নামের সুসংবাদ দাও। হুসাইন রাঃ শুনে বললেন, “না। বরং আল্লাহ তাআলা ক্ষমাকারী। তিনি মেহেরবান এবং দয়ালু। যার আনুগত্য করা হয়।” তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “আচ্ছা, তুমি কে?” সে বলল, “আমি হাওজা এর ছেলে।” তখন তিনি অবচেতনে বলে ফেললেন, “হে মালিক! তাকে জাহান্নামে টেনে নাও।” সে সময় তার ঘোড়া আচমকা ছুটতে শুরু করে। ফলে ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। তার পা রিকাবে আটকে যায়। ঘোড়া তাকে ছেচড়াতে ছেচড়াতে নিয়ে চলে। এর ফলে তার পুরো শরীর টুকরো টুকরো হয়ে যায়। রেকাবে শুধু তার পা দু'টি বাকি থাকে।
হযরত হুসাইন রাঃ এর ছেলে আব্দুল্লাহ। অত্যন্ত সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলেন। এক কুফী সৈন্য তাঁকে দেখে বলল, তাকে আমি অবশ্যই হত্যা করবো। অন্যরা বুঝাল যে, এমন ছোট্ট নাবালেগ শিশুকে হত্যা করে তোর কী ফায়দা? কিন্তু সেই কুফী তার উপর হামলা করল এবং তাকে হত্যা করল।
কুফার কিছু লোকেরা কারবালা প্রান্তরের বিভিন্ন উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে দৃশ্য দেখছিল। হুসাইন রাঃ এর সহায়তার জন্য আল্লাহর কাছে দুআও করছিল। যেন আসমান থেকে সাহায্য এসে হুসাইন রাঃ কে উদ্ধার করে। কিন্তু নিজেরা কিছুই করতে রাজী নয়। তখন একজন ওদের বলে যে, আরে, একটু নিচে এসে হুসাইন রাঃ কে সাহায্য করছো না কেন? কিন্তু তারা কোন উত্তরও না দিতে পারলো না। সাহায্য করতে এগিয়েও এলো না।

হুসাইন রাঃ এর শাহাদাত

হুসাইন রাঃ এর সাথে একশত এর কাছাকাছি লোক ছিল। তাদের মাঝে হযরত আলী রাঃ এর ৫ ছেলে। বনু হাশেমের ১৬ জন। বনু সালিম এবং বনু কেনানার এক দল ছিল। অবশেষে এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সরকারী বাহিনীর হাতে হুসাইন রাঃ এর সকল সাথীবর্গ শহীদ হয়ে যান। যাদের মাঝে দশজন যুবক হুসাইন রাঃ এর নিজের ঘরের ছিলেন।

একটি তীর এসে হুসাইন রাঃ এর কোলের শিশুর গায়ে এসে লাগে। এতে উক্ত কোলের শিশুটিও শাহাদত বরণ করেন। হুসাইন রাঃ শিশুটির শরীর থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বললেন, “হে আল্লাহ! আমাদের এবং তাদের মাঝে তুমিই ইনসাফ কর। ওরা আমাদের এজন্য ডেকেছে এজন্য যে, তারা আমাদের সাহায্য করবে। কিন্তু ওরা এখন আমাদের হত্যা করছে।”

হুসাইন রাঃ এর এ দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায় যে, ওরা শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হবে না। গায়ের কাপড় খুলে বেইজ্জাত করতে চাইবে। তাই তিনি তাঁবুতে ফিরে গেলেন। বললেন,

“আমাকে এমন একটা কাপড় দাও, যা কেউ ছিনিয়ে নিতে পছন্দ করবে না।” যাতে করে কাপড় খুলে নিলেও কম দামী উক্ত চাদরটি যেন শরীরে রেখে যায়। একদম উলঙ্গ করে না ফেলে। তারপর তিনি একটি পুরাতন চাদর জামার নিচে পরিধান করলেন। তারপর তলোয়ার হাতে বেরিয়ে এলেন। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইয়াযিদ বাহিনীর সৈন্যরা হুসাইন রাঃ কে হত্যার সুযোগ পেয়েও করছিল না।

এর কারণ হল, তাদের কেউ হুসাইন রাঃ কে হত্যার দায় নিতে চাচ্ছিল না। একজন চাচ্ছিল অন্যজন হত্যা করুক। অবশেষে শিমার জিলজাওশান সৈন্যদের আহবান করে বলল, তাঁকে হত্যার ব্যাপারে তোমাদের কিসের অপেক্ষা? তখন যুরান বিন শারীক তামীমী হুসাইন রাঃ এর দিকে অগ্রসর হয়ে কাঁধে তরবারী দ্বারা আঘাত করল। এরপর সিনান বিন আনাস আমর নাখয়ি তাঁকে বর্শা দ্বারা আঘাত করল। তারপর ঘোড়া থেকে নেমে মাথা কেটে ফেলে। হুসাইন রাঃ বীরের মত লড়তে লড়তে কারবালা প্রান্তরে শাহাদাত বরণ করেন। নিকৃষ্ট খুনীরা তাঁর শরীর থেকে সকল কাপড় খুলে নেয় পুরাতন চাদরটি ছাড়া। শরীর থেকে মাথাকে আলাদা করে ফেলে।

শিমার হুসাইন রাঃ এর পুত্র আলী আসগর তথা যাইনুল আবেদীন রহঃ কে হত্যা করতে উদ্যত হয়। উমর বিন সা'দ সৈন্যদের বলল, তাকে যেন কিছু না করা হয়। কারণ, তখন তিনি অসুস্থ্য ছিলেন। এরপর সেনাপতি উমর বিন সা'দ এসে বলল, সবাই শুনে রাখ! কেউ যেন এ মেয়েদের তাঁবুতে প্রবেশ না করে এবং এই বালককে হত্যা না করে। আর কেউ তাঁদের কোন সামানপত্র নিলে, সে যেন তা ফিরিয়ে দেয়।

কারবালা প্রান্তরে হযরত হুসাইন রাঃ এর সাথে আবু তালেবের পরিবারের ১৮ জন ব্যক্তি শহীদ হন।

৬ জন হুসাইন রাঃ এর ভাই। যথা- ১) আব্বাস। ২) জা'ফর। ৩) উবায়দুল্লাহ। ৪) উসমান। ৫) মুহাম্মদ। ৬) আবু বকর।

২ জন হুসাইন রাঃ এর ছেলে। যথা ১) আব্দুল্লাহ। ২) আলী আকবর।

৩ জন হাসান রাঃ এর এর ছেলে। যথা- ১) কাসেম। ২) আবু বকর। ৩) আব্দুল্লাহ।

৩ জন আকীল বিন আবী তালেব রাঃ এর ছেলে (মুসলিম বিন আকীল রাঃ এর ভাই)। যথা- ১) জা'ফর। ২) আব্দুর রহমান। ৩) আব্দুল্লাহ।

২ জন আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর বিন আবী তালেব রাঃ এর ছেলে। যথা- ১) আউন। ২) মুহাম্মদ।

২ জন আকীল রাঃ এর নাতি। যথা- ১) আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম। ২) মুহাম্মদ বিন আবী সাঈদ বিন আকীল।

উমর বিন সাদের সৈন্যদের ৮৮ জন নিহত হয়।

ইতিকথা

ইয়াযিদের নির্বাচিত গভর্ণর উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের ধৃষ্টতা সরাসরি এ ঘটনার জন্য দায়ী এতে কোন সন্দেহ নেই। আর ইয়াযিদ সরাসরি নির্দেশ না নিলেও হুসাইন রাঃ এর মক্কা থেকে রওনা হবার সংবাদ পাবার পর উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে হত্যার মত ঘৃণ্য কাজ না করার প্রতি কোন নির্দেশনা না দেয়া ইয়াযিদকেও এ হত্যায় পরোক্ষ দায়ী বলে সাব্যস্ত হয়।

তবে বলা যায়, এর জন্য মূল দায়ী হল, ঐ কুফীরা, যারা হুসাইন রাঃ কে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে কুফায় ডেকে এনেছে।

ইয়াযিদের বিষয়ে মতামত হলো, ইয়াজিদ হুসাইন রাঃ কে হত্যার নির্দেশ দিয়েছে এমন কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। তবে হুসাইন রাঃ এর মত ব্যক্তিত্বের হত্যা ঠেকাতে ইয়াযিদ রাজনৈতিক ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

শাসক নির্বাচিত হবার আগে ইয়াযিদ থেকে কোন প্রকার ফাসেকী ও ধর্মদ্রোহী কাজ প্রকাশ পায়নি। এ কারণেই মুয়াবিয়া রাঃ তাকে পরবর্তী শাসক নির্ধারণ করেন।

শাসক নির্বাচিত হবার পরে কারবালা ঘটনায় বুদ্ধিমত্মার পরিচয় না দেয়া পরোক্ষভাবে হত্যায় সহযোগী হওয়া এবং মর্মান্তিক হাররার ঘটনাসহ তার বিতর্কিত কার্যকলাপ তাকে ফাসেক ও জঘন্য পাপিষ্ঠ হওয়া প্রমাণ করে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা হল, হুসাইন রাঃ এর বিপরীতে ইয়াজিদের প্রশংসা করা জায়েজ নেই। ইয়াজিদের প্রশংসা ও লানত না করে এ ব্যাপারে চুপ থাকা।